দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৭০ বর্ষ, ২১ সংখ্যা ।। ১৫ জানুয়ারি ২০১৮ ।। ১ মাঘ - ১৪২৪ ।। যুগাব্দ ৫১১৯ ।। website : www.eswastika.com ।।

ফিরে দেখা ২০১৭

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ২১ সংখ্যা, ১ মাঘ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

১৫ জানুয়ারি - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

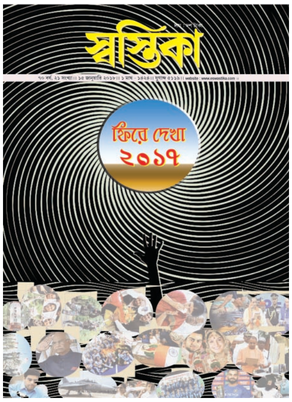

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯

খোলা চিঠি : দিদির পুলিশ, কেমন পুলিশ?
□ সুন্দর মৌলিক □ ১০

এই প্রথম মার্কিন প্রশাসন পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র বললো
□ গূঢ়পুরুষ □ ১১

নোংরা খেলা শুরু করেছে জাতপাতের ঠিকাদাররা
□ রন্তিদেব সেনগুপ্ত □ ১২

সুপ্রিম কোর্টের স্ব-বিরোধী অবস্থানে আংশিক খসড়ার ভবিষ্যৎ
□ ধর্মানন্দ দেব □ ১৪

গুজরাটের নির্বাচনেই কি কংগ্রেস আগামী লোকসভা ভোটের মহড়া সেরে নিয়েছে? □ সাধন কুমার পাল □ ১৭

এক জাতি, এক দেশ, এক কর □ ১৯

চীনের চোখে চোখ, এই ভারত অন্য ভারত □ ২০

তালাকের অন্ধকার থেকে আলোর পথে □ ২১

দেশের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষায় সফল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক □ ২২

ভারতের বৃদ্ধির ঊর্ধ্বমুখী রেখাচিত্র নতুন বছরের আলো
□ রাজীব দেশপাণ্ডে □ ২৭

সূর্যদেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উৎসব মকর সংক্রান্তি
□ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী □ ৩১

জাপানের দেবী সরস্বতী— দেবী বেনজৈতেন
□ সৌমেন নিয়োগী □ ৩৩

দ্রিঘাংচুর ভুয়োদর্শন : তালাক-এ-নওটঙ্কি □ ৩৫

নিরলস সংগ্রামের মহানায়ক রাসবিহারী বসু
□ মণীন্দ্রনাথ সাহা □ ৩৭

নিয়মিত বিভাগ

এইসময়, সমাবেশ সমাচার : ২৪-২৬ □ চিঠিপত্র : ২৯-৩০ □ অঙ্গনা : ৩৪ □ স্বজন বিয়োগ : ৩৯ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ চিত্রকথা : ৪২

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

সাধারণতন্ত্রের সঙ্কট

ভারতের সাধারণতন্ত্র বিশ্বের বৃহত্তম। সত্তর বছরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও সম্প্রতি ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের কয়েকটি সঙ্কট স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার আলোচ্য বিষয় সাধারণতন্ত্রের সঙ্কট। এই সময়ের বিশিষ্ট লেখকরা সঙ্কটাপন্ন ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের চিত্র ও চরিত্র বিশ্লেষণ করবেন। লিখবেন অমলেশ মিশ্র, রন্তিদেব সেনগুপ্ত, অভিমন্যু গুহ প্রমুখ।

দাম একই থাকছে — ১০.০০ টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

Account Name : SWASTIKA

A/C. No. : 0314050014429

IFSC Code : UTBI0BIS158

Bank Name :

United Bank of India

Branch : Bidhan Sarani

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

এন আর সি ও মমতার বিরোধিতা

বিদেশি সমস্যার স্থায়ী সমাধানে সুপ্রিম কোর্টের প্রত্যক্ষ তদারকি ও তত্ত্বাবধানে অসমে ১৯৫১ সালের নাগরিকপঞ্জির নবীকরণ করা শুরু হইয়াছে। ২০১৪ হইতে অর্থাৎ গত তিন বৎসর ধরিয়া অসমে বহু চর্চিত এই রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জি (এন আর সি) উন্নীতকরণের কাজ চলিতেছে। গত ১ জানুয়ারি, ২০১৮-তে পঞ্জির আংশিক খসড়া (Half-NRC) প্রকাশিত হইয়াছে। এন আর সি-র খসড়া হইতে যাহাদের নাম বাদ পড়িয়াছে তাহারা নাগরিকত্ব প্রমাণ করিবার সুযোগ পাইবেন। নাগরিকপঞ্জি সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে করা হইতেছে না। এই পঞ্জির উন্নীতকরণের কাজ ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন, অসম চুক্তি এবং ২০০৩ সালের নাগরিকত্ব বিধির ভিত্তিতেই সম্পন্ন হইতেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে, ২০১৫ সালের ৭ সেপ্টেম্বর কেন্দ্র সরকারের পক্ষে বিজ্ঞপ্তি জারি করিয়া ঘোষণা করা হয়, ধর্মীয় নির্যাতনের কারণে যে সকল হিন্দু, জৈন, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, পার্সি ও শিখ নিজ দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছেন তাহাদের বিদেশি হিসাবে গণ্য করা হইবে না।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অভিযোগ, এই পঞ্জিকরণের মাধ্যমে অসম হইতে বাঙালি বিতাড়নের ষড়যন্ত্র চলিতেছে। বিজেপিই এই ষড়যন্ত্রের হোতা বলিয়া সংসদের ভিতরে ও বাহিরে তাঁহার দল তৃণমূল কংগ্রেস বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছে। মমতার এই অভিযোগ কিন্তু সংবিধান ও সুপ্রিম কোর্টের প্রতি অসম্মান। কেননা নাগরিকপঞ্জি বিজেপি নেতৃত্বাধীন অসম সরকার নয়, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশেই রূপায়িত হইতেছে। নাগরিকপঞ্জি নবীকরণ করা হইতেছে বিদেশি অর্থাৎ বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত করিবার জন্য, বাঙালিদের বিতাড়ন করিতে নয়। অসমে দীর্ঘকাল ধরিয়া অসমিয়া ও বাঙালিরা সুখে শান্তিতে বসবাস করিতেছে। বস্তুত অসমের স্থায়ী বাসিন্দাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্যই নবীকরণ করা হইতেছে নাগরিকপঞ্জি। তাই মমতার প্ররোচনামূলক মন্তব্য অমূলক। তাঁহার এই মন্তব্য বাস্তব পরিস্থিতির পরিপন্থী। তিনি অসমের অসমিয়া-বাঙালির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছেন।

ঘটনা হইল, অসমের বাঙালিদের নাগরিকত্ব নির্ধারণের এই জটিল সন্ধিক্ষণেই মমতা ব্যানার্জির এই বিস্ফোরক মন্তব্য সামনে আসিয়াছে। তিনি বুঝিয়েছেন, অসমের ১ কোটি ২৫ লক্ষেরও বেশি বাংলাভাষীকে বিতাড়নের কথা বলা হইতেছে। বাংলার বহু মানুষ অসমে জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে। এন আর সি-র আড়ালে অসম সরকার তাহাদের বিতাড়ন করিতে চায়। মমতা বিষয়টিকে আগুন লইয়া খেলা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

সঙ্গত কারণেই অসমের প্রতিটি রাজনৈতিক দল ও সংগঠন বিষয়টি লইয়া সোচ্চার হইয়াছে। এন আর সি-র বিরোধিতা আসলে ১৯৭১ সালের পর অসমে আগত 'বিদেশি' বাঙালিদের (পড়ুন বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের) প্রতি মমতার দরদ। নাগরিকপঞ্জির নবীকরণের সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়ার চেষ্টা হইতেছে। রাজনৈতিক ফায়দা তোলাই মমতার লক্ষ্য।

আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গেও বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা কম নহে। ১ কোটিরও অধিক। এই অনুপ্রবেশকারীরা রাজ্যের মানুষের খাওয়া-পরার উপরই শুধু ভাগ বসাইতেছে না, দেশের নিরপত্তার ক্ষেত্রেও প্রশ্নচিহ্ন হইয়া উঠিয়াছে। সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে অসমে অনুপ্রবেশকারীদের সনাক্ত করিবার জন্য যে নাগরিকপঞ্জি নবীকরণ শুরু হইয়াছে, তাহাতে আপত্তির কোনও কারণ থাকিতে পারে না। এই প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই উঠিতে পারে—অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিতকরণের বিরুদ্ধে কেন এই বিরোধিতা?

সুভাষিতম্

জ্ঞাতব্য প্রেষণে ভৃত্যাঃ বান্ধবা ব্যসনাগমে।

আপৎকালে তথা মিত্রং ভার্যাঞ্চ বিভবক্ষয়ে।। (চাণক্যনীতি)

ভৃত্যকে কাজের দায়িত্ব দিলে তার পরীক্ষা হয়, বিপদের সময় বন্ধুর স্বভাব জানা যায়। কঠিন সময়ে মিত্রের এবং সম্পত্তি বিনষ্ট হলে স্ত্রীর প্রকৃত স্বভাব জানা যায়।

সংবিধানের পর সেনা এবং সঙ্ঘই দেশের রক্ষক : বিচারপতি টমাস

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সংবিধানের পর গণতন্ত্র, তারপর সেনাবাহিনী এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘই ভারতীয়দের রক্ষাকর্তা। তবে সংবিধানে বর্ণিত ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে রাখা কোনওমতেই উচিত নয়। এই অভিমত সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি কে.টি টমাসের। কেরলের কোট্টায়ামে অনুষ্ঠিত সঙ্ঘের প্রাথমিক শিক্ষণ শিবিরে তিনি একথা বলেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে তিনি বলেন, 'জরুরি অবস্থার ভয়াবহতা থেকে দেশকে মুক্ত করার ব্যাপারে যদি কোনও সংগঠনকে কৃতিত্ব দিতে হয় তা হলে তা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকেই দেওয়া উচিত।'

সঙ্ঘের সাংগঠনিক শক্তির অন্যতম প্রধান ভিত্তি শৃঙ্খলা। সেই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, সঙ্ঘ 'দেশকে রক্ষা করার জন্য কার্যকর্তাদের শৃঙ্খলার শিক্ষা দেয়। সাপের উপমা দিয়ে তিনি বলেন, 'বিষ সাপের অস্ত্র। আক্রান্ত হলেই সাপ তার অস্ত্র ব্যবহার করে। অন্যথায় করে না। মানুষের শারীরিক শক্তিও অন্য কাউকে আক্রমণ করার জন্য নয়। সঙ্ঘ এটা বিশ্বাস করে এবং সেইমতো কার্যকর্তাদের প্রশিক্ষিত করে তোলে যাতে তারা শুধুমাত্র আত্মরক্ষার কারণেই শারীরিক শক্তি ব্যবহার করেন। এই মনোভাব খুবই প্রশংসনীয়। আমার মনে হয় সঙ্ঘের শারীরশিক্ষার উদ্দেশ্যই হলো দেশ ও সমাজ আক্রান্ত হলে তাকে রক্ষা করা।'

কে. টি. টমাস

প্রাক্তন বিচারপতি বলেন, 'যদি আমায় কেউ জিজ্ঞাসা করেন ভারতের মানুষ কেন নিরাপদ? আমি বলব ভারতের একটি সংবিধান আছে, ভারতে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত, ভারতের সেনাবাহিনী সারা বিশ্বে অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং সবশেষে বলব ভারতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ নামের এক প্রতিষ্ঠান আছে। এদের জন্যই ভারতের মানুষ নিরাপদ।' এরপরেই ধর্ম এবং ধর্মনিরপেক্ষতা প্রসঙ্গে বলেন, 'ভারতের সংখ্যালঘুরা ধর্মনিরপেক্ষতাকে নিজেদের সুরক্ষার প্রয়োজনে ব্যবহার করেন। যদিও ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ আরও ব্যাপক। এর উদ্দেশ্য প্রতিটি মানুষের আত্মমর্যাদাবোধ সুরক্ষিত করা। ভারতে আজকাল আমরা হিন্দু বলতে একটা ধর্ম বুঝি। কিন্তু হিন্দু একটি সংস্কৃতির নাম। অতীতে হিন্দুস্থান বললে এক বিশেষ সাংস্কৃতিক পরিচয়সম্পন্ন মানবগোষ্ঠীর দেশ বোঝাত। দুর্ভাগ্যবশত এখন নামটি বিজেপি এবং সঙ্ঘ ভিন্ন আর কেউ মুখেও আনেন না।'

সবশেষে প্রাক্তন বিচারপতি কে.টি টমাস দীর্ঘদিন ধরে দেশের মানুষকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে ধন্যবাদ দেন এবং আদর্শে অবিচল থাকার আহ্বান জানান।

লভ জিহাদের ঘটনা নিয়ে গ্রন্থ প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট আয়োজিত দিল্লির জাতীয় গ্রন্থমেলায় লভ জিহাদে খুন হওয়া যুবক-যুবতীদের সত্য ঘটনা অবলম্বনে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। জাতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত একটি প্রকাশনা সংস্থা বইটি প্রকাশ করেছেন। বইটির নাম 'এক মুখৌটা অ্যায়সা ভী'। গ্রন্থ পরিচিতিতে বলা হয়েছে, 'লভ জিহাদ পর কেন্দ্রিত কাহানি সংগ্রহ'। অর্থাৎ লভ জিহাদে নিহত যুবক-যুবতীদের কাহিনি সংগ্রহ। এতে রয়েছে ১৫টি কাহিনি। লিখেছেন ড. বন্দনা গান্ধী। ড. গান্ধী ভূপালের একটি কলেজের সমাজতত্ত্ব এবং শিক্ষাতত্ত্বের শিক্ষক। প্রকাশন সংস্থা অর্চনা প্রকাশের পক্ষ থেকে ওমপ্রকাশ গুপ্তা বলেন, 'বইটি লভ জিহাদের ফলে নিহতদের জীবন অবলম্বনে লিখিত। পাত্রপাত্রীদের নাম শুধু বদলে দেওয়া হয়েছে। এই প্রকাশনার উদ্দেশ্য হিন্দু মহিলাদের সচেতন করে তোলা।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ১২ জন প্রকাশকের সম্মিলিত প্রয়াসে সৃষ্টি হয়েছিল রাষ্ট্রীয় সাহিত্য সঙ্গম। যার একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো অর্চনা প্রকাশন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচার প্রমুখ রাজীব টুলি বলেন, 'যে-বারোজন প্রকাশককে নিয়ে রাষ্ট্রীয় সাহিত্য সঙ্গম তৈরি হয়েছে তারা সকলেই জাতীয়তাবাদী ভাবধারার মানুষ। এই প্রথম তাঁরা সঙ্ঘের এরকম একটি উদ্যোগে শামিল হলেন।'

আধার কার্ডের মাধ্যমে ৮০ হাজার ভূতুড়ে শিক্ষকের সন্ধান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আধার কার্ডে তথ্য দেওয়া বাধ্যতামূলক হয়ে যাওয়াতে দেশব্যাপী ৮০ হাজারের বেশি এমন শিক্ষকের সন্ধান পাওয়া গেছে যাঁরা একাধিক প্রতিষ্ঠান থেকে ভুয়ো পরিচয় দিয়ে বেতন নিয়ে যাচ্ছেন। একই ব্যক্তি আইন লঙ্ঘন করে তিন-চারটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেতন তালিকায় রয়েছেন এমন নজির মিলেছে। মানব সম্পদ দপ্তরের তরফে এদের ভুতুড়ে শিক্ষক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সম্প্রতি দিল্লিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর সর্বভারতীয় প্রতিবেদন প্রকাশ করে জানান, এ যাবৎ ৮৫ শতাংশ শিক্ষকদের তথ্য তাদের প্রদত্ত আধার

প্রকাশ জাভড়েকর

কার্ডের ভিত্তিতে সংগৃহীত হওয়ার সূত্রে এই কেলেঙ্কারি সামনে এসেছে। শ্রী জাভড়েকর জানান ‘বেশ বড় সংখ্যক ভূতুড়ে শিক্ষকের অস্তিত্ব রয়েছে যারা প্রক্সি দেওয়ার পদ্ধতিতে বিভিন্ন কলেজে পুরো সময়ের শিক্ষকতা করে বেতন নিচ্ছেন। এ পর্যন্ত চিহ্নিত ৮০ হাজারের বিরুদ্ধে সরকার জলদি ব্যবস্থা নিতে চলেছে। মন্ত্রী আরও জানান, কেন্দ্রীয় কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এই ধরনের ভুয়ো শিক্ষকের সন্ধান পাওয়া যায়নি। ভূতুড়ে শিক্ষকরা মূলত বিভিন্ন রাজ্যের সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বেআইনি কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

প্রতিবেদন অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষায় যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলির সংখ্যা ও সেখানে ভর্তি হওয়ার অনুপাত Gross Enrolment Ratio ৫ বছর আগের ২১.৫ শতাংশ থেকে বর্তমানে ২৫.৫ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। লক্ষণীয়ভাবে বিগত ৫ বছরে উল্লেখিত জিইআর মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট শ্লথ ভাবে বেড়েছে। ২০১২-১৩-তে (১৮-২৩ বছরের শিক্ষার্থীর) সংখ্যা ৪.১৫ শতাংশ থেকে ২০১৬-১৭ সালে বেড়ে মাত্র ৪.৯০ শতাংশে পৌঁছেছে। নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের উচ্চশিক্ষায় অনীহার এটি প্রধানযোগ্য সূচক।

সন্ত্রাস প্রশ্নে ফের পাকিস্তানের পাশে চীন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সন্ত্রাস প্রশ্নে পাকিস্তানের পাশে ফের বন্ধু চীন। আমেরিকা কেন শুধু পাকিস্তানের দিকে আঙুল তুলছে, প্রশ্ন তুলেছেন চীনের বিদেশ-মন্ত্রকের মুখপাত্র লু কাঙ্। গত ৮ জানুয়ারি এক সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তানের বিষয়ে আমেরিকার ভূমিকা নিয়ে তীব্র উষ্মার পাশাপাশি কাঙ্ জানান, সন্ত্রাস প্রশ্নে কোনো নির্দিষ্ট দেশকে চিহ্নিত করার বিরোধী চীন। বস্তুত চীনের এই ভূমিকা নতুন নয়। নানা ছুলছুতোয় পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদে মদত যুগিয়েছে তারা। রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী সদস্য হওয়া আটকানো থেকে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে পাকিস্তানের সঙ্গে অর্থনৈতিক করিডর তৈরি, সন্ত্রাসের ব্যাপারে চীন বরাবরই পাকিস্তানের পাশেও ভারতের বিরুদ্ধে।

গত সপ্তাহেই খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পাকিস্তানকে সন্ত্রাসে মদত দেওয়া বন্ধ করার ব্যাপারে হুঁশিয়ারি দেন। এমনকী আমেরিকার টাকা আত্মসাৎ করে আফগানিস্তানে তালিবান ও হাক্কানি জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে পাকিস্তানের সমঝোতা করার অভিযোগ ওঠে। সেই মোতাবেক ২০ লক্ষ মার্কিন ডলারের অনুদানও বন্ধ হয়ে যায় পাকিস্তানের। সন্ত্রাস নিয়ে বিশ্বদরবারে পাকিস্তান ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছে বুঝে আসরে নামে চীন। কাঙ্ তার বিবৃতিতে পাকিস্তানের এই মার্কিন অনুদান বন্ধ নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

প্রসঙ্গত, সন্ত্রাসের ব্যাপারে চীনের এই পাক-সহযোগিতা নিয়েও বিশ্ব জুড়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে। সম্প্রতি হোয়াইট হাউসের তরফেও অভিযোগ তোলা হয় যে চীন পাকিস্তানকে সন্ত্রাসে মদত যোগাচ্ছে এবং পাকিস্তানকে জঙ্গিদের স্বর্গরাজ্য বানাতে সাহায্য করছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিযোগ করেছিলেন গত ১৫ বছরে আমেরিকা পাকিস্তানকে সন্ত্রাস বন্ধের জন্য ৩ কোটি ৩০ লক্ষ মার্কিন ডলার অনুদান দিয়েছিল, যে টাকার পুরোটাই জলে গিয়েছে।

কূটনৈতিক মহল মনে করেন আমেরিকার মাথায় দিনের পর দিন টুপি পড়িয়ে সন্ত্রাস বন্ধ করার জন্য পাকিস্তানের টাকা নিয়ে উল্টে সন্ত্রাসে মদত দেওয়া— এই খেলা ট্রাম্প ধরে ফেলায় বিপদ শুধু পাকিস্তানের নয়, চীনেরও। কারণ এর ফলে ভারতের অভিযোগের সত্যতাই প্রমাণিত হচ্ছে। ভারত-মার্কিন সম্পর্কও ক্রমশ উন্নতি হওয়ায় পাকিস্তান-চীন উভয়েই প্রমাদ গুনেছে। তাই কখনও উত্তর কোরিয়া, কখনও পাকিস্তান চীন তার সন্ত্রাসী বোরেদের ব্যবহার করছে, ভারত ও আমেরিকা দু’ দেশেরই বিরুদ্ধে।

ল' বোর্ড মুসলমান মহিলাদের ওপর অত্যাচার বহাল রাখতে চায় : কংগ্রেসি মন্ত্রী আরিফ খান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সোশ্যাল মিডিয়ায় পূর্বতন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরিফ মহম্মদ খান অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড (AIMPLB)-কে তিন তালাক প্রসঙ্গে বেনজির আক্রমণ করেছেন। শ্রী খান বোর্ডকে দায়ী করে তাঁর টুইটারে লিখেছেন, তিন তালাক বিল নিয়ে বিতর্ক আদৌ কংগ্রেস বা বিজেপি কেন্দ্রিক নয়। এটি আদতে মুসলমান মহিলাদের সঙ্গে ক্ষমতাশালী মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের লড়াই। বোর্ড প্রথম থেকেই মহিলাদের ওপর অত্যাচার চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী। তিনি ল বোর্ড-কে তৃণমূল স্তরের পরিস্থিতি সম্পর্কে অজ্ঞ আখ্যা দিয়ে বিলটি যে মুসলমান মেয়েদের ক্ষতি করবে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আরিফ মহম্মদ খান

খানের বক্তব্য অনুযায়ী অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ভাবে যে সমস্ত মুসলমান মহিলা তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা, সম্মান ও সমান অধিকারের দাবিতে তিন তালাক প্রথার বিলোপ চেয়েছেন, ল বোর্ড তাদের বিরুদ্ধে তিন তালাকের মতো নিন্দনীয় প্রথা চালু রেখে তাদের বরাবরের মতো দাবিয়ে রাখতে চায়। বোর্ডের কর্তারা রাজ্যসভায় বিলটি আটকে দেওয়ার জন্য কংগ্রেস ও অন্যান্য দললের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন বলে খান ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। নিজের মানসম্মান বজায় রেখে পেট চালাতে না পারলেও বোর্ড তিন মাসের বেশি কোনও তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে অর্থ সাহায্য দেয় না। এদেরই চাপে ১৯৮৬ সালে সরকারকে সাহাবানু মামলায় সামান্য খোরপোশ দেওয়া থেকে সরকারকে পিছু হটতে হয়। আজ সেই একই গোত্রের ব্যক্তিরা এখন দাবি করছে যে তিন তালাক বেআইনি হলে যদি তালাক দেওয়া স্বামী জেলে যায়, তাহলে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ভরণপোষণ কে করবে? এর চেয়ে দ্বিচারিতা কী হতে পারে?

যুগোপযোগী আইডিয়ার সন্ধানে ভারত-ইজরায়েলের অভিনব উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কৃষি জলপ্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্যক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যাগুলির সঠিক মোকাবিলার জন্য ভারত ও ইজরায়েল এক অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে। দু'দেশের যৌথ উদ্যোগে শুরু হয়েছে একটি প্রতিযোগিতা, যার নাম ইন্ডিয়া-ইজরায়েল গ্লোবাল ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ। এখনও পর্যন্ত অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা ১৮। কেউ যদি অংশ নিতে চান, দেরি করবেন না। প্রতিযোগিতাটি আইডিয়ার। প্রতিটি দল কৃষি, জলপ্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্যক্ষেত্রের সমস্যাগুলি কীভাবে সমাধান করা যায় তার আইডিয়া দেবে। যার আইডিয়া সেরা বলে বিবেচিত হবে। সেটাই প্রয়োগ করা হবে। বিজয়ী আইডিয়ার যথাযথ প্রয়োগে দলগুলিকে সাহায্য করবে ইনভেস্ট ইন্ডিয়া এবং ইজরায়েল ইনোভেশন অথরিটি। ইজরায়েল সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানেয়াহু এই প্রতিযোগিতার কথা ঘোষণা করেছিলেন। ইন্ডিয়া ইজরায়েল ইনোভেশন ব্রিজ চুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো এই প্রতিযোগিতা। সূত্রের খবর অনুযায়ী, প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে দু'দেশের বিভিন্ন স্টার্টআপ গোষ্ঠী, টেকনিক্যাল হাব, কর্পোরেশন এবং পরিবেশ রক্ষার সঙ্গে যুক্ত একাধিক বিশেষজ্ঞ।

ইন্ডিয়া-ইজরায়েল ইনোভেশন ব্রিজ দু'দেশের স্টার্টআপ গোষ্ঠীগুলিকে স্বাস্থ্য, কৃষি এবং জলপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের সব থেকে জটিল সমস্যাগুলির সমাধান খুঁজে বের করার আহ্বান জানিয়েছিল। প্রতিযোগিতার প্রথম পর্যায়ে 'আই লভ নাইন মান্থস ফিটনেস সলিউশন' এবং 'বায়সক্যান রিসার্চ' নামের দুটি স্টার্টআপ ওই তিনটি ক্ষেত্রে বিজয়ী হয়েছে। রানার আপ হয়েছে ইনোভফোরসাইট হেল্থ, বায়োমেডিক্যাল সিস্টেম, জেওয়েব টেকনলজিস। অন্যদিকে, কৃষিক্ষেত্রে ফসলের দাম ঠিকমতো না পাওয়ার এবং বাজার ও চাষির সম্পর্ক আরও উন্নত করা— এই দুটিই সব থেকে বড়ো চ্যালেঞ্জ। এই পর্যায়ে বিজয়ী হয়েছে অ্যামভিকিউব এবং আর এফ ওয়েভ টেকনোলজিস। রানার আপ হয়েছে ইউকিটিকস টেকনোলজিস এবং অম্বর সলিউশনস। সব শেষে জলপ্রযুক্তি। এক্ষেত্রে সমস্যা হলো বর্জ্য জল পরিশোধনে অত্যধিক খরচ। প্রয়োজন বিদ্যুৎ-সাশ্রয়কারী এবং কম খরচের পরিশোধন ব্যবস্থা। দেশের বৃহৎ জলাধারগুলির শোধনও গুরুত্বপূর্ণ। এই বিভাগে বিজয়ী হয়েছে ইনোটেক ইনভেনশন এবং পিওর পানি। রানার আপ হয়েছে বনিতা প্রসাদ, রিনাল্ডো জন, কার্তিককুমার এস এবং ওসিও ওয়াটার। বিজয়ীদের পুরস্কার মূল্য ২-৫ লক্ষ টাকা। জলপ্রযুক্তির পুরস্কার মূল্য ১০-২০ লক্ষ টাকা।

ডিজিটাল ইন্ডিয়া : তৈরি এক লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতকে সম্পূর্ণ ‘ডিজিটালাইজড’ করে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পদস্থ আধিকারিকেরা কোনও পাথরই উল্টে দেখতে বাকি রাখছেন না। ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রকল্পে অভূতপূর্ব সাড়া দিয়েছে ভারতীয় যুবক-যুবতীরা। সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত ১ লক্ষ ছেলেমেয়ে এই প্রকল্পের স্বেচ্ছাসেবক হবার জন্য নাম নথিভুক্ত করেছে। উল্লেখ্য, ডিজিটাল সেবা প্রকল্প সাধারণ নাগরিক এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে যোগাযোগ আরও স্পষ্ট করে। মানুষ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক এবং এজেন্সিগুলির ডিজিটাল ইন্ডিয়া সংক্রান্ত কাজকর্ম সম্বন্ধে বিশদে জানতে পারেন।

এই প্রকল্পের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে স্বেচ্ছাসেবার সুযোগ রয়েছে। যে কোনও যুবক তার ভালোলাগা এবং দক্ষতা অনুযায়ী এই প্রকল্পে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগ দিতে পারেন। স্বেচ্ছাসেবকেরা সাধারণ মানুষকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম সম্বন্ধে সচেতন করে তোলার জন্য কাজ করবে। তার জন্য তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ইংরেজি থেকে অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদের কাজও তারা করবেন।

উবাচ

“মিথ্যা প্রচার না করে বাংলার স্বার্থে মমতাও নাগরিকপঞ্জী তৈরি করুন।”

অসমে নাগরিকপঞ্জী নিয়ে মমতার মিথ্যা প্রচার প্রসঙ্গে

ড. সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্য
আসুর মুখ্য উপদেষ্টা

“সাংবাদিকের বিরুদ্ধে নয়, আধার তথ্য ফাঁসের জন্য অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে এফ আই আর করা হয়েছে।”

সম্প্রতি আধার তথ্য ফাঁস বিতর্ক প্রসঙ্গে টুইট বার্তায়

রবিশঙ্কর প্রসাদ
কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী

“রাজ্যের সমস্ত ধর্মীয় স্থান ও পাবলিক প্লেস থেকে বেআইনি লাউড স্পিকার খুলে ফেলতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো ধর্মীয় ভেদাভেদ করা হবে না।”

শব্দ দূষণ রুখতে নির্দেশিকা জারি প্রসঙ্গে

যোগী আদিত্যনাথ
মুখ্যমন্ত্রী, উত্তরপ্রদেশ

“রানি পদ্মিনীর আত্মত্যাগ নিয়ে রাজস্থান আজও গর্ব করে। তিনি আমাদের কাছে শুধু ইতিহাসের একটি অধ্যায় নন, রাজস্থানের মানুষের কাছে তিনি আত্মমর্যাদার প্রতীক। কোনও অবস্থাতেই আমরা তাঁর সম্মান ভূলুণ্ঠিত হতে দেব না।”

সঞ্জয়লীলা বনসালির ছবি পদ্মাবতীর মুক্তি প্রসঙ্গে

বসুন্ধরা রাজে
রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী

“শুধু বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানি করে লাভ নেই। ভারতে তৈরি করতে হবে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র।”

দেশে তৈরি অস্ত্রশস্ত্রের উপযোগিতা প্রসঙ্গে

বিপিন রাওয়াত
ভারতের সেনাপ্রধান

দিদির পুলিশ, কেমন পুলিশ ?

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
নবান্ন, হাওড়া

দিদি, এমনটা কোথাও হয় না। আপনি সত্যিই দেখিয়ে দিয়েছেন। সিপিএমও পারেনি এমন সাফল্য দেখাতে। পুলিশকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে বুদ্ধবাবুদের জুড়ি মেলা ভার ছিল কিন্তু কেউ পুলিশ অফিসারকে দিয়ে মা ডাকাতে পারেনি। শুধু মা নয়, বনদেবীও ডেকেছেন আইপিএস অফিসার। জঙ্গলমহলের মা বলে সম্বোধনও করেছেন। সেই চোখের মণি মেয়ে ভারতী এখন আপনার চোখের বালি। কিন্তু এটা তো মানতে হবে পোষ মানানো কাকে বলে সেটা আপনি দেখিয়ে দিয়েছেন।

সারদা থেকে নারদা কিংবা রোজভ্যালি সব কিছুতে আপনার পোষ মানানো পুলিশ যে কেরামতি দেখিয়েছে তার নজির নেই। এই কৃতিত্ব আপনার। আপনিই তো ওদের পোষ মানিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। কোন তথ্য লোপাট করে দিতে হবে, কোথায় অভিযোগকারীকে হেনস্থা করতে হবে এসব ব্যাপারে আপনার পুলিশ যা করে দেখিয়েছে তাতে সত্যিই অন্য রাজ্যের নকল করা উচিত। কেন্দ্রেরও নকল করা উচিত। আপনার পুলিশ আদালতে গিয়ে ধমক খেয়েছে কিন্তু আর এস এস-এর সভা বানচাল করার চেষ্টা থেকে বিজেপি সাংসদের মেলা বন্ধ করা কিংবা মা দুর্গার বিসর্জন বাতিল করার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে। আদালতের গাল খেলেও আপনার নির্দেশ অমান্য করা থেকে কেউ তাদের টলাতে পারেনি।

কিন্তু দিদি এখন বিপদ অন্য। মোদী সরকার নামে এক শক্তি বড্ডই অদম্য। এখন তারা পুলিশের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করতে চাইছে। ইতিমধ্যে সারদাকাণ্ডে সিবিআই-কে বিধাননগর নর্থ থানার পুলিশের ভূমিকা খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর (পিএমও)। সিবিআই'কে চিঠি দিয়ে তদন্ত শুরুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও খবর।

তদন্তের নির্দেশ সংক্রান্ত প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের চিঠি হাতে পেয়েছে সিজিও কমপ্লেক্স, এমনটাই সূত্রের খবর। সারদা অর্থলগ্নি সংস্থার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগে ২০১৩ সালের এপ্রিলে প্রথম তদন্ত শুরু করেছিল রাজ্য পুলিশ। তারই অংশ হিসাবে রাজ্য সেই সময় গঠন করেছিল স্পেশাল ইনভেস্টিগেটিং টিম (সিট)। সেই টিমই সারদা-কাণ্ডের তদন্ত শুরু করে। সেই সময় তদন্ত সঠিক ভাবে না করা, তথ্য ও প্রমাণ লোপাট-সহ একাধিক অভিযোগ তুলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি দিয়েছিলেন রাজ্যের এক সাংসদ। তিনি আবার তৃণমূলেরই সাংসদ।

যদিও পরে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সারদা কেলেঙ্কারির তদন্ত রাজ্য পুলিশের হাত থেকে সিবিআইয়ের হাতে যায়। রাজ্যের ওই সাংসদের অভিযোগ পেয়ে তা খতিয়ে দেখতে সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশনারকে প্রথম পাঠায় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর। ভিজিল্যান্স কমিশনার প্রাথমিক তদন্ত করেন। সূত্রের খবর, তদন্তের পরে কমিশনার জানিয়েছিলেন, অভিযোগ গুরুতর। তা খতিয়ে দেখতে বিস্তারিত তদন্ত প্রয়োজন। কমিশনারের সেই নোট-সহ তদন্তের জন্য একটি চিঠি পিএমও থেকে পাঠানো হয়েছে সিবিআই'কে।

সূত্রের খবর, দপ্তরের ওই চিঠিকে হাতিয়ার করেই সিবিআই এবার ফের সারদা-কাণ্ডে রাজ্য পুলিশের ভূমিকা খতিয়ে দেখতে চলেছে। সারদা-কাণ্ডে রাজ্য পুলিশের ভূমিকা সিবিআই খতিয়ে দেখলে তা নিয়ে আরেক দফা চাপে পড়বেন না তো দিদি! ওরা মানে পুলিশ চাপে পড়ে বলে দেবে না তো যে সবই আপনার নির্দেশে হয়েছে।

—**সুন্দর মৌলিক**

এই প্রথম মার্কিন প্রশাসন পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র বললো

গূঢ় পুরুষের কলম

বিশ্বজুড়ে ভয়, আতঙ্ক এবং সন্ত্রাসের পরিবেশ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়করা প্রতিদিন হুমকি দিচ্ছেন যে পরমাণু বোমা বহনকারী ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে তাঁরা শত্রুদের ধ্বংস করে দেবেন। এশিয়ার ছোট্ট দেশ উত্তর কোরিয়া বলছে বোতাম টিপে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে বিশ্বের মানচিত্র থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্বই মুছে দেবে। একই কথা বলছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এসব হুমকির অর্থটা ঠিক কী আমি জানি না। তবে এটুকু বুঝি পরমাণু বোমা ব্যবহার করলে শুধু একটি বা দুটি দেশ ধ্বংস হবে না। সারা পৃথিবী পারমাণবিক দূষণের কবলে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। রাষ্ট্রনায়করা একথা জানেন না তা নয়। তবু তাঁরা এসব কথা বলেন নিজেদের শক্তিধর প্রমাণ করতে। সত্যি এ এক অদ্ভুত আঁধার নেমেছে পৃথিবীর জুড়ে।

আমাদের দক্ষিণ এশিয়া আজ বিপন্ন সন্ত্রাসবাদী দেশ পাকিস্তান এবং তার মিত্র চীনের দৌরাত্ম্যে। এই দুই দেশই চাইছে মানচিত্র থেকে ভারতকে মুছে ফেলতে। চীন এবং পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্রই পরমাণু শক্তিধর। তবে ভয়টা বেশি পাকিস্তানকে। কারণ, জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়করা ভারত-বিরোধী। বিশ্বের এক নম্বর সন্ত্রাসবাদী দেশ। পাকিস্তান চারবার ভারত আক্রমণ করেও সুবিধা করতে পারেনি। প্রতিবারই পরাজিত হয়ে বেত্রাহত কুকুরের মতোই ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়েছে। তবু শিক্ষা হয়নি। আমেরিকার দেওয়া পরমাণু অস্ত্র দেখিয়ে ভারতকে খতম করার হুমকি দিয়ে চলেছে। এই প্রথম একজন মার্কিন প্রেসিডেন্ট পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করে সব রকম সামরিক সাহায্য দেওয়া বন্ধ করেছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্টের ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এটাই যথেষ্ট নয়। সন্ত্রাসবাদীদের দমনের নামে গত সাত দশক ধরে পাকিস্তান মার্কিনিদের কাছ থেকে কয়েক হাজার কোটি ডলার খয়রাতি অর্থ সাহায্য নিয়েছে তা পুরোপুরি ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত আন্তর্জাতিক আর্থিক অবরোধ বলবৎ করা উচিত। আলকায়দা প্রধান ওসাবা বিন লাদেনকে সপরিবার আশ্রয় দিয়েছিল পাকিস্তান সরকার। পরে লাদেন ধরা পড়ে যাওয়ার পরেও আমেরিকার ওবামা সরকারের ঘুম ভাঙেনি। পাকিস্তানকে সামরিক এবং আর্থিক খয়রাতি সাহায্য দিয়ে গেছে। পাকিস্তান সেই অর্থ খরচ করেছে ভারতে সন্ত্রাসবাদ ছড়াতে। ধর্মরক্ষার নামে মোল্লা মৌলবিরা ভারতে যতটা প্রশ্রয় পায় ততটা বিশ্বের কোনো মুসলমান রাষ্ট্রে পায় না। বিবাহিতা মুসলমান মহিলাদের নিরাপত্তা ও স্বার্থরক্ষায় জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে বিলটি এনেছে তার বিরোধিতা করে তৃণমূল নেত্রী বুঝিয়ে দিয়েছেন যে তিনি ভোটের রাজনীতি করেন। মা, মাটি মানুষের রাজনীতি নয়।

চলতি বছরেই ফেব্রুয়ারি মাসে ত্রিপুরা, মেঘালয় ও নাগাল্যান্ডে ভোট। কংগ্রেস শাসিত কর্ণাটকে ভোট মে মাসে। চলতি বছরের শেষ দিকে ভোট হবে বিজেপি-শাসিত রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং কংগ্রেস-শাসিত মিজোরামে। এর মানে ২০১৮ সালে আটটি রাজ্যে বিধানসভার ভোট হবে। এই আটটি রাজ্যের সাতটি বিজেপির দখলে এলে তৃণমূল নেত্রী তাঁর শয়নে স্বপনে বিজেপি আতঙ্কে ভুগবেন। এমনিতেই মুকুল রায়ের বিজেপিতে যোগদানের পর রোজই দিনের আলোয় ভূত দেখছেন। আয়কর বিভাগ জানতে চেয়েছে দলীয় তহবিলে বিপুল পরিমাণ ভূতুড়ে টাকা জমা পড়েছে কীভাবে। গোপন টাকার উৎস না জানালে ৭০ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হবে। নেত্রী এখন কী করেন সেটাই দেখার। তৃণমূল দলে সদস্যভুক্তির চাঁদা নেই। থাকলে নেত্রী বলতেন, দলীয় তহবিলে সদস্যদের চাঁদা জমা পড়েছে। সারদা চিটফান্ডের সুদীপ্ত সেন জেলে পচছেন। একদা তিনি দিদির আঁকা ছবি কয়েক কোটি টাকায় কিনতেন। এখন কেউ দিদির আঁকা ছবি কেনে না। বিনা পয়সায় দিলেও কেউ নেয় না।

বিশ্বজুড়ে যে সন্ত্রাসের আতঙ্ক ছড়াচ্ছে তা রুখতে গেলে ভারতকে শক্তিশালী হতে হবে। ভারত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। তাই চলতি বছরে ছয় সাতটি রাজ্যের নির্বাচনে বিজেপিকে জিততে হবে। মুসলমান জেহাদিদের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে লোকসভা এবং রাজ্যসভায় যথেষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে যে তিন তালাক বিল রাজ্যসভায় বিরোধীরা আটকে দিয়েছে স্রেফ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগে। তবে আশা আছে এই চলতি বছরেই রাজ্যসভায় বিজেপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে যাবে। মোদী সরকার চীন ও পাকিস্তানকে রুখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বাধা পাবে না। ■

উত্তর সম্পাদকীয়

নোংরা খেলা শুরু করেছে জাতপাতের ঠিকাদাররা

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

গুজরাট এবং হিমাচল প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনেও জয় অধরা থেকে যাওয়ার পর এবার চিরাচরিত নোংরা রাজনৈতিক খেলাটি খেলতে নেমে পড়েছে কংগ্রেস। খেলাটি হলো, জাতিবিদ্বেষের আগুন সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়ে নিজের রাজনৈতিক ফায়দাটি লুটে নেওয়া। এই খেলায় কংগ্রেসের দোসর হয়েছেন জিগ্নেশ মেভানি, অল্পেশ ঠকরে, উমর খালিদের মতো তরুণ নেতারা— যাঁরা জাতপাতের বিদ্বেষ উসকে দিয়ে আর ভারতকে হাজার টুকরোয় ভেঙে দেওয়ার কথা বলে রাজনীতির পাদপ্রদীপের আলোয় আসার চেষ্টা করছেন। আর এদের সকলের অন্তরালে আছে এমন এক শক্তি, যারা ভারতের ঐক্য সংহতি এবং অখণ্ডতাকে ধ্বংস করতে চাইছে, যারা অন্তরাল থেকে উমর খলিদের মতো ভারত-বিদ্বেষী নেতাকে পরিচালনা করছে। ভারতকে ধ্বংস করার, দেশের ভিতরে হিংসার আগুন জ্বালানোর কী সুগভীর চক্রান্তের জাল এরা বিছিয়েছে— তা বোঝা গিয়েছিল গুজরাট নির্বাচনের সময়ই। হার্দিক প্যাটেল, জিগ্নেশ মেভানি, অল্পেশ ঠকরেরা জাতপাতের রাজনীতিকে হাতিয়ার করে এবার গুজরাটে নির্বাচনে লড়তে নেমেছিলেন। ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচন এবং ২০১৬-য় উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের পর যে জাতপাতের রাজনীতি অনেকটাই আপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছিল। গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনের সময় সেই জাতপাতের রাজনীতিকেই আবার উসকে দিয়েছিলেন এই নেতারা। আর এই ধ্বংসাত্মক শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী— যাঁর লক্ষ্য যেন তেন উপায়ে ক্ষমতা দখল। ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার আগুনে দেশের মানুষ জ্বলেপুড়ে মরলেও যাঁর কিছু যায় আসে না। এত করেও অবশ্য গুজরাটের জয় এই বিভেদকামী শক্তির অধরাই থেকে গিয়েছে। কিন্তু জিততে পারুক বা না পারুক, গুজরাট নির্বাচনের পর্ব থেকেই বোঝা গিয়েছিল জাতপাতের বিষবৃক্ষে আবার নতুন করে জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গুজরাটের ভোটপর্বেই এই রাজনীতির অবসান হবে না। বরং, গুজরাটের ভোটপর্ব মিটলে সারা দেশেই এই আগুন জ্বালানোর চেষ্টা হবে। গুজরাটের ভোটপর্ব মিটে যাওয়ার পর একমাস কাটতে না কাটতেই সেই আশঙ্কা সত্যি হয়েছে।

জিগ্নেশ মেভানি, অল্পেশ ঠকরে, উমর খলিদের মতো নেতারা গুজরাট নির্বাচনে প্রথম রাউন্ডের খেলাটি খেলেছিলেন। কিন্তু এদের চক্রান্ত যে সুগভীর, তা বোঝা যাচ্ছে এবার মহারাষ্ট্রে জাতপাতের রাজনীতি করে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করায়। সম্প্রতি ভীমা-কোরেগাঁও যুদ্ধে দলিতদের জয়কে তুলে ধরতে মহারাষ্ট্র কয়েকটি দলিত সংগঠন একত্র হয়ে একটি সভার আয়োজন করে। সমাবেশের বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই জিগ্নেশ মেভানির মতো নেতারা উত্তেজক কথাবার্তা বলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করছিলেন। তখনই বোঝা যাচ্ছিল এদের উদ্দেশ্যটা খুব সাধু নয়। অসৎ উদ্দেশ্যটি ধরা পড়ে যায় সমাবেশের দিনই। এই সমাবেশে বক্তা ছিলেন জিগ্নেশ মেভানি, উমর খালিদ এবং রোহিত ভেমুলার মা রাধিকা। ওই সমাবেশের মঞ্চ থেকেই জিগ্নেশ এবং উমর খালিদ লোক তাতাতে শুরু করেন। এবং তার ফলশ্রুতিতে কিছুক্ষণের ভিতরই হিংসা ছড়িয়ে পড়ে মুম্বই ও শহরতলিতে। পরিষ্কার হয়ে যায়, দলিতদের স্বার্থে নয়, বরং দলিতদের নিজ রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে ফায়দা লুটতে চেয়েছেন এই তথাকথিত দলিত নেতারা। হিংসার আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে সেই উত্তাপে হাত সেঁকে নিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করেছেন তাঁরা। তাদের এই আগুন দিয়ে খেলা দেখে আতঙ্কিত হওয়ার যথেষ্টই কারণ আছে। আজ মহারাষ্ট্রে তারা আগুন লাগাচ্ছেন। কাল যে মধ্যপ্রদেশ, পরশু বিহার, তার পরদিন উত্তরপ্রদেশ, তারও পরে দেশব্যাপী হিংসা ও ঘৃণার আগুন যে লাগাবেন না— তার কোনো গ্যারান্টি আছে? দেশের অখণ্ডতা এবং নিরাপত্তার স্বার্থেই দলিতদের সামনে রেখে এই নোংরা রাজনীতিক আড়ালে প্রকৃত উদ্দেশ্য কী, কারা এর পিছনে কলকাঠি নাড়ছে, তা নিয়ে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত হোক। প্রকৃত সত্য তাহলেই প্রকাশিত হবে। তাহলেই প্রমাণিত হবে জিগ্নেশ মেভানি, উমর খলিদরা কত বড় দলিতপ্রেমী।

এই বিভেদকামী শক্তির পাশে দাঁড়িয়ে বিবৃতি দিচ্ছেন রাহুল গান্ধী। নিশানা করছেন সঙ্ঘ পরিবারকে। বলছেন, সঙ্ঘ পরিবার দলিতদের দমন করার পথে হাঁটছে। রাহুল এবং এই স্বঘোষিত দলিত নেতারা কি ইতিহাস জানেন? নাকি, কংগ্রেস এতদিন যা করেছে, সত্য ইতিহাসকে চাপা দিয়ে মিথ্যা ইতিহাস প্রচার করে এক্ষেত্রেও দলিতদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে? জিগ্নেশদের বক্তব্য, ১৮১৮ সালে পুণের কাছে কোরেগাঁওয়ে দলিত যোদ্ধারা বাজীরাও পেশোয়ার সৈন্যবাহিনীকে হারিয়েছিল। তারই শতবর্ষ উদ্‌যাপনে এই সভা। ওই সভামঞ্চ থেকেই জিগ্নেশরা বলেছিলেন, এবার ওই কোরেগাঁওয়ের যুদ্ধের মতোই দলিতরা সঙ্ঘ পরিবারকে লড়াই করে হারাবে। কিন্তু জিগ্নেশদের এই বক্তব্যের ভিতর সত্য ইতিহাস কতটা? জিগ্নেশরা যা বলছেন, তা তো পুরোপুরি সত্য নয়। ১৮১৮ সালের ওই যুদ্ধে বাজিরাওয়ের সৈন্যরা লড়েছিল ব্রিটিশ সেনাদের সঙ্গে। আর দলিত মাহার যোদ্ধারা ছিল ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর অংশ। ব্রিটিশরা এই যুদ্ধে

পেশোয়া বাজিরাওকে পরাজিত করে এবং ওখানে একটি বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করে। এই জয়কে গৌরবান্বিত করার অর্থ তো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকেই গৌরবান্বিত করা। ওই যুদ্ধ আদৌ দলিত বনাম উচ্চবর্ণের লড়াই ছিল না। ওটি ছিল পেশোয়ার সঙ্গে ব্রিটিশদের লড়াই। তাহলে কি অর্ধসত্য বলার কারণ কী? কারণ এটাই কী যে, মিথ্যা বলে সুপরিকল্পিতভাবে এদেশে হিন্দু জনগোষ্ঠীর ভিতর ভাঙন সৃষ্টি করা? জিগ্নেশ মেভানি এবং উমর খলিদ জে এন ইউ-এর ছাত্র। এই ছাত্ররা কুকথা বলতে যতটা দড়, ইতিহাস চর্চায় যে ততটাই অনভিজ্ঞ সে বোঝাই যাচ্ছে। আর রাহুল গান্ধী? এদেশের ইতিহাস, ভূগোল কোনোকিছুই তিনি জানেন না। জানার ইচ্ছাও তাঁর নেই। রাহুল জানেন বিপদে পড়লে মাতুলালয় ইতালিতে পিঠটান দেওয়ার সুবন্দোবস্ত তাঁর রয়েছে। রাহুল বলছেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ দলিত এবং নিম্নবর্ণের মানুষকে আজও অচ্ছুত জ্ঞান করে। রাহুল কি বলতে পারবেন— দক্ষিণ ভারতের যে মন্দিরগুলিতে দলিত এবং নিম্নবর্ণের মানুষদের প্রবেশ নিষিদ্ধ— সেরকম ক'টি মন্দিরে কংগ্রেস দলিতদের প্রবেশাধিকার দেওয়ার জন্য আন্দোলন করেছে? বরং রাহুলের জেনে রাখা ভালো গুরুভায়ুর মন্দিরে দলিতদের প্রবেশাধিকারের জন্য যখন পুট্টাপ্পা অনশনে বসতে চেয়েছিলেন, তখন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী তাঁকে অনশনে বসতে নিষেধ করেছিলেন। কেরলের এই গুরুভায়ুর মন্দিরেই দলিতদের প্রবেশাধিকারের দাবিতে ১৯৮২ সালের অক্টোবর মাসে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেছিলেন। ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সঙ্ঘের নেতৃত্বেই একশো হরিজন তিরুঅনন্তপুরম থেকে পদযাত্রা করে গুরুভায়ুর মন্দিরে পৌঁছেছিল। যে মহারাষ্ট্রে এখন জাতপাতের আগুন জ্বালাতে চাইছেন জিগ্নেশ মেভানিরা, সেই মরারাষ্ট্রের বিদর্ভ জেলার গাড়েগাঁওয়ের ১৯৭০ সালে ভাগবত সপ্তাহ উপলক্ষে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা উচ্চ-নীচ সব শ্রেণীর হিন্দুকে একই পংক্তিতে বসিয়ে ভোজন করিয়েছিল। ওই মহারাষ্ট্রেরই ভামবেরিতে আম্বেদকর জয়ন্তীতে দলিতদের শোভাযাত্রায় বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে নিয়ে যোগ দিয়েছিলেন স্বয়ংসেবকরা। ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন উচ্চ-নীচ শ্রেণীভেদ। দিল্লি, হরিয়ানা, মীরাট প্রভৃতি স্থানে কন্যাপূজন অনুষ্ঠানে প্রায় ৫ হাজার দলিত কন্যাকে দেবীজ্ঞানে পূজা করা হয়েছে সঙ্ঘের উদ্যোগে। শুধু গুরুভায়ুর মন্দির নয়, দক্ষিণ ভারতের বেশ কিছু মন্দিরে সঙ্ঘের আন্দোলন এবং উদ্যোগের ফলেই দলিতরা প্রবেশাধিকার পেয়েছেন। সর্বসময় টুইট চর্চা না করে কংগ্রেস সভাপতি একটি উদাহরণ দিয়ে দেখান না, যেখানে কংগ্রেস দলিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এমন একটি লড়াই লড়েছেন।

সঙ্ঘ পরিবারকে চারটি গালিগালাজ করার আগে রাহুল গান্ধীর ইতিহাস অধ্যয়ন করা উচিত। জানা উচিত, তৎকালীন বোম্বে প্রেসিডেন্সি থেকে বাবাসাহেব আম্বেদকর সংবিধানসভায় নির্বাচিত হতে পারেননি কেবলমাত্র কংগ্রেসের বিরোধিতার কারণে, শেষ পর্যন্ত এই বাংলা থেকে এসে তিনি লড়েছিলেন এবং জিতেছিলেন। তবে এখানেও তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে নেমেছিলেন কংগ্রেস নেতা কিরণশংকর রায়।

জিগ্নেশ মেভানির মতো স্বঘোষিত দলিত নেতা হাত মিলিয়েছেন উমর খলিদের সঙ্গে। কে এই উমর খলিদ? এ সেই উমর খলিদ— যিনি পাকিস্তানি জঙ্গিদের সুরে সুর মিলিয়ে ভারতকে হাজার টুকরো করে দেওয়ার কথা বলেছেন। যিনি স্লোগান দিয়েছিলেন মণিপুর মাঙ্গে আজাদি, কেরল মাঙ্গে আজাদি। জিগ্নেশ মেভানিও তো একটু অকথা কুকথার চর্চা না করে বাবাসাহেব আম্বেদকরের রচনাগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করতে পারেন। দলিত আন্দোলনের নাম করে আম্বেদকর তো কোথাও দেশবিরোধী ইসলামিক শক্তির সঙ্গে হাত মেলানোর কথা বলেননি। বরং, বারবার এই দেশবিরোধী ইসলামিক শক্তির বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন আম্বেদকরা। কংগ্রেসের তোষণ নীতির বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। দেশভাগ পর্বে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো আম্বেদকরও একশো শতাংশ ধর্মীয় সংখ্যালঘু বিনিময়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। উমর খলিদের সঙ্গে হাত মিলেয়ে জিগ্নেশ মেভানি দলিত-মুসলিম ঐক্যের খোয়াব দেখছেন। তা যে কখনই সম্ভব নয়, তা বহু আগেই আম্বেদকর বলে গিয়েছেন। আর যোগেন মণ্ডলের মতো দলিত নেতারা দলিত-মুসলিম ঐক্যের খোয়াব দেখে পরে নিজের জীবন দিয়ে বুঝেছিলেন— কোন মারাত্মক ভুল তাঁরা করেছেন। বেশি দূরে নয়, পাশের দেশ বাংলাদেশেই দলিত হিন্দুরা মুসলমানদের হাতে কেমন অত্যাচারিত হচ্ছেন— তা এই স্বঘোষিত দলিত নেতারা একটু খোঁজ নিলেই তো জানতে পারবেন।

আসলে ভারতের অখণ্ডতা এবং নিরাপত্তাকে বিনষ্ট করার এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। যারা ভারতকে হাজারো টুকরোয় ভাগ করে দেওয়ার কথা বলে, তারাই যখন দলিতের জন্য কুম্ভিরাশ্রু বর্ষণ করে— তখনই বুঝতে হয় চক্রান্তটি কোথা থেকে হচ্ছে, কীভাবে হচ্ছে। ভারতের হিন্দু সমাজকে যদি হাজার টুকরোয় বিভক্ত করে দেওয়া যায়, উচ্চবর্ণ এবং দলিত যদি ভাগ করে দেওয়া যায় তাদের, হিন্দু সমাজকে যদি লিপ্ত করে দেওয়া যায় ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায়— তাহলে কার লাভ? কাদের লাভ? লাভ তাদেরই, যারা এই দেশটির ওপর দখলদারি কায়েম করে একে আর একটি ইসলামিক রাষ্ট্র বানানোর স্বপ্ন দেখছে। কাজেই দলিত আন্দোলনের নাম করে যা হচ্ছে তা যে প্রকৃতই দলিতের স্বার্থ রক্ষার লড়াই এমন ভাবলে চলবে না। দলিতকে চাল করে দেশকে বিকিয়ে দেওয়ার খেলা শুরু হয়েছে। এ আগুন আর বেশি দূর ছড়িয়ে পড়ার আগে কেন্দ্র সরকারের উচিত কঠোর হাতে একে দমন করা। জাতপাতের রাজনীতি করে সারা দেশে যাঁরা আগুন জ্বালাতে চাইছেন— তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া। এবং সর্বোপরি আয়ের সঙ্গে তাঁদের জীবনযাত্রায় কতখানি সঙ্গতি আছে তা তদন্ত করে দেখা। তাহলেই বোঝা যাবে পেট্রোডলারে কার কার ভাঁড়ার ভরে উঠল।

আর হিন্দুর কর্তব্য? হিন্দুর কর্তব্য একটিই। কোনো মিথ্যা প্রচার এবং প্ররোচনায় না ভুলে, সমস্ত ভেদাভেদ এবং ছোঁয়াছুঁয়ির ঊর্ধ্বে উঠে সংগঠিত হওয়া। সংগঠিত হিন্দুই পারবে এই বিদেশি এজেন্টদের ঘৃণ্য রাজনীতি থেকে ভারকে মুক্ত করতে। ■

সুপ্রিম কোর্টের স্ব-বিরোধী অবস্থানে আংশিক খসড়ার ভবিষ্যৎ

ধর্মানন্দ দেব

বিগত তিন বছর থেকে অসম রাজ্যে বহুচর্চিত, বহুবন্দিত, বহু প্রত্যাশিত বিদেশিমুক্ত বিশুদ্ধ Half-NRC গত ১ জানুয়ারি, ২০১৮ (৩১ ডিসেম্বর মধ্য রাত্রির পর) প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়েছে। আংশিক খসড়া যদিও প্রকাশ হয়েছে কিন্তু 'আংশিক খসড়া' প্রকাশনা নিয়ে দেশের বা অসম রাজ্যের কোনো আইনের উল্লেখ নেই। তবুও দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে আংশিক খসড়া প্রকাশ হয়েছে। সংবিধান হচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ আইন। দেশের এই সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম খণ্ডে আমরা পাই দেশের বিচারব্যবস্থার কথা। প্রধান ধর্মাধিকরণ বা সুপ্রিমকোর্ট হলো ভারতের সর্বোচ্চ আদালত। কেন্দ্র-রাজ্য বিষয়ে বা আন্তঃরাজ্য বিষয়ে সুপ্রিমকোর্ট একমাত্র আপিল আদালত। দেশের এই সর্বোচ্চ আদালতের প্রত্যক্ষ তদারকি ও তত্ত্বাবধানে বৈধ ভারতীয় নাগরিকের নাম নথিভুক্ত করে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৯৫১ সালের রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জী উন্নীতকরণের কাজ অসমে আরম্ভ হয়েছিল এবং বর্তমানেও চলছে। এই কাজ ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন, অসম চুক্তি এবং ২০০৩ সালের নাগরিকত্ব বিধির ভিত্তিতেই সম্পন্ন হচ্ছে। তাই ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চকে ভিত্তিবর্ষ রেখে সমগ্র অসম রাজ্যে রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জী উন্নীতকরণের কাজ পূর্ণাঙ্গরূপে শুরু হয় ২০১৪ সালে। কেননা ২০১৪ সালের ১৭ ডিসেম্বর তারিখে ৭০ পৃষ্ঠার এক যুগান্তকারী রায় প্রদান করে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। ওই রায় প্রদান করার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা নেন সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি তথা অসম সন্তান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ। হয়তো ডিব্রুগড় বা গৌহাটি গীতানগরে থাকা অনেক পারিবারিক আত্মীয়স্বজনও রয়েছেন এই রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জী উন্নীতকরণের আবেদনকারী। তাই জনমনে নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠা অতি স্বাভাবিক। তাইতো অসমের কৃষক নেতা অখিল গগৈকে বলতে শুনা গিয়েছে— ''অসমের প্রকৃত জাতীয় নায়ক ন্যায়াধীশ রঞ্জন গগৈ''।

যাইহোক, ২০০৫ সালে নোটিফিকেশন জারি করেও কংগ্রেস সরকার রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জী উন্নীতকরণের কাজ আরম্ভ করতে পারেনি। ২০১০ সালে পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে কাজ আরম্ভ করেও মাঝপথে বন্ধ করে দেওয়া হয়। কেননা সামনে চলে আসে বরপেটা কাণ্ড। তাই ২০১৪ সালে সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশেই অসম রাজ্যে রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জী উন্নীতকরণের কাজ শুরু হয়। সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদ্বয় যথাক্রমে রঞ্জন গগৈ এবং রোহিন্তন নারিম্যানের খণ্ড বিচারপীঠের রায় মেনেই অসমের এন.আর.সি. উন্নীতকরণ বর্তমান অংশিক হলেও খসড়া প্রকাশ হয়েছে। কিন্তু ভিত্তিবর্ষ ১৯৫১ না ১৯৭১ সাল হবে তার কোনো মীমাংসা আজও হয়নি। এনিয়ে অসম সম্মিলিত মহাসঙ্ঘের কার্যকরী সভাপতি মতিউর রহমান ১৯ নভেম্বর ২০১২ সালে একটি রিট পিটিশন দাখিল করে যার নম্বর ৫৬২/২০১২। ওই খণ্ড বিচারপীঠ সেই মামলার প্রারম্ভিক শুনানি করে এবং গুরুত্ব অনুধাবন করে ৭০ পৃষ্ঠার রায় প্রদান করে ভিত্তিবর্ষ ১৯৫১ না ১৯৭১ সাল হবে বিষয়টি মীমাংসা করার জন্য পাঁচ বিচারপতির এক সাংবিধানিক বেঞ্চে প্রেরণ করেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ভিত্তিবর্ষ নির্ধারণ না করে বা এই ব্যাপারে সাংবিধানিক বেঞ্চের চূড়ান্ত রায় ঘোষণার অপেক্ষা না করে আংশিক খসড়া প্রকাশের নির্দেশ সুপ্রিমকোর্টের কতটুকু যুক্তিসঙ্গত। যদি এমন হয় যে সাংবিধানিক বেঞ্চ ভিত্তিবর্ষ ১৯৫১ বলে রায় প্রদান করে তবে এই প্রকাশিত আংশিক খসড়ার ভবিষ্যৎ কী হবে। দেশের আমজনতার আর্থিক, শারীরিক বা মানসিক ক্ষতির দায়ভার কে বহন করবে।

শুধু তা নয়, আমরা জানি ২০১৫ সালের ০৭ সেপ্টেম্বর কেন্দ্র সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফ থেকে পাসপোর্ট (ভারতে প্রবেশ) আইন ১৯২০ এবং ১৯৪৬ সালের বিদেশি আইনের অধীনে দু'টি নোটিফিকেশন জারি করে বলা হয়েছে— '৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ সাল পর্যন্ত ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে হিন্দু, জৈন, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, পার্সি, এবং শিখ ধর্মাবলম্বী মানুষ অর্থাৎ বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘু মানুষ নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছেন তাদের ক্ষেত্রে পাসপোর্ট (ভারতে প্রবেশ) আইন ১৯২০ এবং ১৯৪৬ সালের বিদেশি আইন প্রযোজ্য হবে না। মানবিক কারণেই তাদের ভারতে থাকতে দেওয়া হবে প্রয়োজনীয় বৈধ নথিপত্র ছাড়াই।' আর এই দু'টি নোটিফিকেশনের বিরুদ্ধে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে মামলা হয়। অসমের প্রণব কুমার মজুমদার-সহ আরও ৯ জন বিশিষ্ট নাগরিক এই মামলা করেন। মামলার নম্বর ৬৮/২০১৬। পূর্বে উল্লেখ করা দুই বিচারপতি এই মামলাটিও ২০১৬ সালের ১০ মার্চ এক নির্দেশ প্রদান করে সাংবিধানিক বেঞ্চে প্রদান করেন। যদি সাংবিধানিক বেঞ্চ এই মামলায় নোটিফিকেশন দু'টিকে সাংবিধানিক হিসাবে বৈধ ঘোষণা করে তবে আংশিক খসড়ার বা আসুর বিদেশি খেদাও আন্দোলন বলুন বা অসম চুক্তি বলুন কী হবে? তাই এইসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়ের অপেক্ষা না করে দুই বিচারপতির খণ্ডপীঠ আংশিক খসড়া প্রকাশের নির্দেশ কতটুকু গ্রহণযোগ্য।

এছাড়াও দীপক কুমার নাথের দাখিল করা সুপ্রিমকোর্টে ৩১১/২০১৫ নম্বরের রিট পিটিশনও রয়েছে। ওই রিট পিটিশনে বলা হয়েছে ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনকে ২০০৩ সালে সংশোধন করে ৩ (ক) ধারা সন্নিবেষ্টিত করা হয়েছিল আর ওই ৩ (ক) ধারাকে অবৈধ ঘোষণা করার জন্য এই মামলায় ২০১৫ সালের ২১ জুলাই দুই

বিচারপতি খণ্ডপীঠ সাংবিধানিক বেঞ্চে পাঠিয়ে দেন। এক্ষেত্রেও সেই একই প্রশ্ন, সাংবিধানিক বেঞ্চের চূড়ান্ত নির্দেশ বা রায়ের অপেক্ষা না করে আংশিক খসড়া প্রকাশ কতটুকু স্থায়িত্ব লাভ করবে তা সহজেই অনুমেয়। ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনটি আবার সংশোধনের জন্য কেন্দ্র সরকার ২০১৬ সালের ১৯ জুলাই একটি বিল সংসদে পেশ করে। ২০১৬ সালের ১১ আগস্ট বিলটি পাঠিয়ে দেওয়া হয় যৌথ সাংসদীয় কমিটির কাছে পরীক্ষণের জন্য। বর্তমানেও বিলটি যৌথ সাংসদীয় কমিটির বিচারাধীন রয়েছে। বিলটি সমগ্র দেশের জন্য হলেও শুধুমাত্র অসম রাজ্যে বিলের বিরোধিতার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বিলের বিরোধী যারা তাদের প্রশ্ন হচ্ছে, অমুসলমানদের নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য বিলে যে ধর্মীয় শ্রেণীবিভাজন করা হয়েছে তা আইনসঙ্গত নয়? এদের স্লোগান হচ্ছে— 'ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব বিল মানব না'। এদের একপ্রকার মুখপাত্র হয়ে সংবিধান বিশেষজ্ঞদের একাংশ এবং বুদ্ধিজীবীরাও বলছেন, এই বিল সংবিধানের ১৪ এবং ১৫ নম্বর অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করা হয়েছে। সকলের জানা সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে রয়েছে সাম্যের অধিকার (Right to Equality) এবং ১৫ নম্বর অনুচ্ছেদে রয়েছে ধর্ম, জন্মস্থান, ভাষা, বর্ণ, লিঙ্গ ও জাতির ভিত্তিতে বৈষম্য করা যাবে না (Prohibition of discrimination of grounds of religion race, caste, sex or place of birth)। উলেখ্য, সংবিধানের ১৫ নম্বর অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হবে শুধুমাত্র ভারতীয় নাগরিকদের ক্ষেত্রে। ওই অনুচ্ছেদের সুবিধা পাবেন না কোনো বিদেশি। আর সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদ নিয়ে সুপ্রিমকোর্ট একটি ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা করেছিল ১৯৫২ সালের ১১ জানুয়ারি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বনাম আনোয়ার আলি সরকার মামলা প্রসঙ্গে এই রায়। বলাবাহুল্য, ওই রায়টি আজও বহাল রয়েছে। সুপ্রিমকোর্টের তৎকালীন মুখ্যবিচারপতি এম, পতাঞ্জলি শাস্ত্রীর নেতৃত্বে সাত বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ ওই রায় প্রদান করেন। ওই রায় অনুসারে ন্যায়সঙ্গত শ্রেণীকরণ করা যায়। পিছনে থাকতে হবে ন্যায়সঙ্গত কারণ। অবশ্য শ্রেণীভিত্তিক আইন তৈরি করা যাবে না। ওই রায়ে মুখ্যবিচারপতি স্পষ্ট বলেছেন— 'Article 14 of the Constitution does not mean that all laws must be general in character and universal in application. The State must possess the power of distinguishing and classifying persons or things to be subjected to particular laws and in making a classification the legislation. 'ওই মামলায় সুপ্রিমকোর্ট আরও বলেছে যে a just cause for discrimination is permissible on the basis of a real and substantial distinction relating to the objects sought to be achieved. এইটুকু আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে প্রকৃত-উপযুক্ত বাস্তবসম্মত পার্থক্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্য আইনে বৈষম্যে বা শ্রেণীবিভাজন করা যায়। নাগরিকত্ব প্রদান ও বাতিলের ক্ষেত্রে কেন্দ্র সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তারাই যাচাই করে দেখবে দেশীয়করণের মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভের আবেদনপত্র। ১৯৯৫ সালে দেশের সর্বোচ্চ আদালত অন্য একটি মামলায় স্পষ্ট বলেছে— 'The Legislature is Competent to make classification. It is upon the Legislature to identify the class of people to be given protection and on what basis such protection is given. Court cannot interfere." দেশের বিভিন্ন হাইকোর্টও এইরূপ মত ব্যক্ত করেছে। উল্লেখযোগ্য, হাইকোর্টগুলির মধ্যে হচ্ছে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট। শিশুওয়ালা পাল বনাম ভারত সরকার মামলায় বলেছে নাগরিকত্বের বিষয়টি সম্পূর্ণ আইন প্রণেতাদের ব্যাপার। এ ব্যাপারে আদালত নাক গলাতে পারে না। তাই নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিলে যে ধর্মীয় শ্রেণী বিভাজনের কথা বলা আছে আর সেটি যদি দেশের আইনপ্রণেতাদের সিলমোহর পড়ে ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের যথাযথ স্থান পেয়ে যায়, তবে সেটি অসাংবিধানিক বা অযৌক্তিক হবে না। সেই শ্রেণীবিভাগ হবে ন্যায়সঙ্গত। তাইতো ২০১৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর জারি করা দু'টি রুলসেও ছিল ধর্মীয় পরিচিতি। দেশের সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্ট এই রুলস দু'টিকে অবৈধ আখ্যা দেয়নি, বরং দেশের বিভিন্ন হাইকোর্ট এই রুলস দুটির উপর ভিত্তি করেই হিন্দু উদ্বাস্তুদের সুরক্ষা দিয়ে রায় প্রদান করেছে। উল্লেখযোগ্য, হাইকোর্টগুলির মধ্যে হচ্ছে— গৌহাটি ও কলকাতা। এটাও বলে নেওয়া ভালো যে, দেশ বিভাজন হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতেই। তাই ওই উদ্বাস্তু যাদের কেন্দ্র সরকার বসবাসের অধিকার দিয়েছে এখন তাদের নাগরিকত্ব প্রদান না করে ভাসমান অবস্থায় রাখা হলে তা হবে তাদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ। এটা সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদের পরিপন্থী।

উল্লেখ্য, বিলটি শুধু অসমে নয় সমগ্র দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এছাড়াও বিলে 'বাঙালি হিন্দু' বলে কোনো শব্দ নেই। ২০১৬ সালের নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিলে যে ধর্মীয় বিভাজন রয়েছে সেটা আইনসঙ্গত এবং যুক্তিসঙ্গত। সেই সঙ্গে রয়েছে মানবিকতা এবং পূর্বপ্রতিশ্রুতি। এটি কোনোভাবেই সংবিধান বিরোধী হবে না। অবশ্য এই সংশোধনী বিল সংসদে পাশ হওয়ার আগে বিলে (প্রস্তাবনা-সহ) কিছুটা সংশোধন ও সংযোজন করে নেওয়া ভালো।

দেশের সর্বোচ্চ আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চে থাকা উপরোক্ত বিষয়গুলি সমাধান হওয়ার পর এবং সংসদে থাকা ২০১৬ সালের নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিলটি পাশ হওয়ার পরই পুর্ণাঙ্গ খসড়া প্রকাশ করা হোক। নতুবা এন আর সি-র কোনো মূল্য থাকবে না। আর জানুয়ারি মাসের প্রথম তারিখে আংশিক খসড়া প্রকাশ শুভ না অশুভ তা সময়েই বোধগম্য হবে। এই মুহূর্তে সুপ্রিমকোর্টের স্ব-বিরোধী অবস্থানে আংশিক খসড়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে অশনি সংকেত পাওয়া যাচ্ছে।

(লেখক আইনজীবী)

গুজরাটের নির্বাচনেই কি কংগ্রেস আগামী লোকসভা ভোটের মহড়া সেরে নিয়েছে?

সাধন কুমার পাল

ভারতীয় রাজনীতিতে যে নতুন যুগের সূচনা হয়েছে তা গুজরাট ও হিমাচল প্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর আরও ভালোভাবে অনুভব করা যাচ্ছে। দুই দশক আগে ভারতীয় রাজনীতিতে অস্পৃশ্য হিসেবে চিহ্নিত ভারতীয় জনতা পার্টির অবস্থান এতটাই মজবুত যে বিগত নির্বাচনের তুলনায় কয়েকটি আসন কম পেয়ে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখার মতো ঘটনাও বড় অঘটন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে বড় ধরনের আলোড়ন সৃষ্টি করছে। আবার বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে শাসন ক্ষমতায় থাকা কংগ্রেস এখন এতটাই দুর্বল যে আগের নির্বাচনের তুলনায় পরাজয়ের মার্জিন সামান্য কমাতে পারলে তা বড় ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে হইচই পড়ে যাচ্ছে। গুজরাটে বিগত বাইশ বছর ধরে কংগ্রেস ক্ষমতার বাইরে। পরপর পাঁচবার পরাজিত হওয়ার পর সদ্য সমাপ্ত ২০১৭-র বিধানসভা নির্বাচনে ষষ্ঠ বার পরাজিত হয়েছে। তবে এবার কংগ্রেস গত নির্বাচনের তুলনায় ১৬টি আসন বেশি পেয়েছে। মাঝে মাঝে বিদেশে ছুটি কাটাতে যাওয়া কংগ্রেস দলের সভাপতি রাহুল গান্ধী গুজরাটের নির্বাচনে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়াতে এক শ্রেণীর মিডিয়া রাহুল গান্ধীর উদয় দেখেছে, সেই সঙ্গে শতাব্দী প্রাচীন কংগ্রেস দলের পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা খুঁজে পাচ্ছে।

পরিসংখ্যান বলছে, বিগত দিনগুলিতে গুজরাটে বিজেপির প্রাপ্ত ভোটের হার ৪৮-৪৯ শতাংশের মধ্যেই ঘোরা ফেরা করে যা কিনা যে-কোনো রাজনৈতিক দলের কাছেই সর্বোচ্চ প্রাপ্তি। ২০১২ সালে বিজেপি পেয়েছিল ৪৭.৯ শতাংশ এবার

কেমব্রিজ এনালিটিকার অফিস

> **কট্টরপন্থী মুসলমানদের ভোট টানতে কাশ্মীরি কট্টরপন্থী মুসলমান সলমান নিজামিকে গুজরাটে ভোটের প্রচারে নামানো, খ্রিস্টান পাদরিকে দিয়ে কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার জন্য ফতোয়া জারি করানো বা নির্বাচনের আগে রাহুল গান্ধীর মন্দির দর্শন— এই সবই যে কেমব্রিজ এনালিটিকা নামক সংস্থার পেশাদারি পরামর্শের ফসল তা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।**

অর্থাৎ ২০১৭ সালে পেয়েছে ৪৯.১ শতাংশ ভোট। কংগ্রেসের ভোট থাকে ৩৮-৩৯ শতাংশের আশেপাশে। ১৯৯০-এর পর এবার প্রথম কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট ২ শতাংশ বেড়ে ৪০ শতাংশেরও বেশি হয়ে গিয়েছে। ফলে ১৬টি আসন বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২ সালের তুলনায় কংগ্রেসের আসন ৬১টি থেকে বেড়ে হয়েছে ৭৭।

এবারের নির্বাচনে তপশিলি জাতি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত বেশ কিছু আসন বিজেপির হাতছাড়া হয়েছে। ২০১২ সালে তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত ১৩টি আসনের মধ্যে বিজেপি পেয়েছিল ১০টি আসন। ২০১৭-র নির্বাচনে ৩টি আসন কংগ্রেসের কাছে হারিয়ে পেয়েছে মাত্র ৭টি আসন। তপশিলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত ২৮ আসনের মধ্যে ২০১৬ সালে বিজেপি পেয়েছিল ১৬টি আসন, ২০১৭ সালে ৬টি আসন কংগ্রেসের কাছে হারিয়ে পেয়েছে ১০টি। এই আসন হ্রাস পাওয়ার বিষয়টি যদি এসসি এসটি ভোটারদের প্রবণতা ধরে নেওয়া হয় তাহলে বলতে হবে এই প্রবণতার প্রভাব অসংরক্ষিত আসনেও পড়েছে। কারণ ২০১৭ এর নির্বাচনে তিন হাজারেরও কম ভোটে বিজেপি ১১টি আসন হারিয়েছে।

শহর এলাকায় বিজেপির শক্তি অটুট রয়েছে। ফলে সুরাট ও সংলগ্ন এলাকায় হার্দিক প্যাটেলের তথাকথিত পাতিদার আন্দোলনের কোনো প্রভাব পড়েনি। পাশাপাশি জিএসটি নিয়ে ব্যবসায়ীদের সাময়িক সমস্যাগুলিকে ক্ষোভ বিক্ষোভে পরিণত করার প্রয়াসও ফলপ্রসূ হয়নি। এই নির্বাচনে কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে অনেক আসন হাতছাড়া ও ফিরে পাওয়ার ঘটনা খুব বেশি প্রচারের আলোতে আসেনি। বিজেপি

২০১২-র হিসেবে কংগ্রেসের কাছে ৩৩টি আসন হারিয়েছে, কংগ্রেস বিজেপির কাছে ১৮টি আসন হারিয়েছে। বিজেপি ৭৫ জন বিধায়ককে টিকিট দিয়েছিল যার মধ্যে ২০ জন পরাজিত হয়েছেন। কংগ্রেস যে ২৪ জন বিধায়ককে টিকিট দিয়েছিল তার মধ্যে ৮ জন পরাজিত হয়েছেন। এক তৃতীয়াংশ বিধায়ক পরাজিত হওয়ার অর্থ এটাই যে এর প্রতিষ্ঠান বিরোধী অসন্তোষ স্থানীয় ভাবে ক্রিয়াশীল। অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে গুজরাটের নির্বাচক মণ্ডলীর এই মিশ্র রায়ের মধ্যে প্রত্যেকটি দলের জন্যই একটি কড়াবার্তা লুকিয়ে আছে।

সামগ্রিক ভাবে গুজরাটের নির্বাচনী ফলাফল বলে দিচ্ছে ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এখন যথেষ্ট পরিণত। রাজ্য পরিচালনার বিকল্প কোনো মডেল উপস্থাপন না করে কংগ্রেস দলিত-পাতিদার-ওবিসি সংরক্ষণের গাজর ঝুলিয়ে জাতপাতের ভিত্তিতে গুজরাটের জনগণকে বিভাজিত করে, ভোটের সময় রাহুল গান্ধী মন্দিরে মন্দিরে পুজো দিয়ে হিন্দুত্ববাদী ভাবনায় সুড়সুড়ি দিয়ে, নোট বাতিল, জিএসটির মতো বড় সিদ্ধান্ত রূপায়ণের ক্ষেত্রে মানুষের সামগ্রিক সমস্যাগুলিকে ক্ষোভের আগুনে পরিণত করে, প্রতিষ্ঠান বিরোধী অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে সস্তায় বাজিমাত করতে চেয়েছিল। গুজরাটের মানুষ অল্পেশ, জিগনেশ, হার্দিক ও রাহুল গান্ধীদের পাতা ফাঁদে পা দেয়নি।

জাতপাতের ইস্যু তুলে সস্তা রাজনীতির দিন যে শেষ হয়ে এসেছে উত্তরপ্রদেশের পর গুজরাট আরও একবার তা প্রমাণ করে দিল। কিন্তু যে মিডিয়া আজ রাজনৈতিক ভাবে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাওয়া কংগ্রেসকে বিশ্লেষণের মারপ্যাঁচের দৌলতে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে চাইছে সেই মিডিয়া ও বিশ্লেষকদের বক্তব্য হলো জাতিগত সমীকরণ ও রাহুল গান্ধীর মন্দির দর্শনের জেরেই কংগ্রেসের কপাল ফিরছে।

একটি প্রশ্ন কিন্তু সমস্ত ভারতবাসীকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে, তাহলো হিমাচল প্রদেশে ক্ষমতা ধরে রাখতে কংগ্রেস তেমন কোনো প্রয়াস না করলেও গুজরাটে আদাজল খেয়ে নামল কেন? রিপোর্ট বলছে, বিশ্বজুড়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভাবমূর্তিকে ধাক্কা দিতে দু' বছর আগেই কংগ্রেস কেমব্রিজ এনালিটিকা নামে একটি সংস্থাকে বরাত দিয়েছিল। ওবামা সমর্থক হিলারি ক্লিনটনকে পরাজিত করে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বিজয়ী করার কারিগর বিশ্বের সবচেয়ে দামি এই আমেরিকান সংস্থাটির পরামর্শ অনুসারেই কংগ্রেস সমস্ত শক্তি গুজরাটে সংহত করেছিল। দু' বছর আগে চুক্তি হলেও কেমব্রিজ এনালিটিকা শুরুর ছ' মাস পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে প্যাটেলদের জন্য সংরক্ষণ সম্ভব নয় জেনেও পর্দার পেছনে কংগ্রেসকে রেখে হার্দিক প্যাটেলকে দিয়ে পাতিদার আন্দোলনের নামে গুজরাটে অশান্তির আগুন জ্বালায়। বছর দেড়েক আগে পতিদারদের বড় বড় সমাবেশে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হতো সেই অর্থের জোগানদাতা অনুসন্ধান করলেই এই বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হবে। ফলও আসে হাতেনাতে। প্যাটেল অধ্যুষিত সৌরাষ্ট্র এলাকায় কংগ্রেস বিজেপির চেয়ে বেশি আসনে জয়ী হয়।

এই সংস্থার পরামর্শ ক্রমে কংগ্রেসের অদৃশ্য হাতের শক্তিতেই অল্পেশ ঠকোর প্যাটেলদের সংরক্ষণ বিরোধী ওবিসি আন্দোলন শুরু করে। ঠিক একই ছক অনুসারে শুরু হয় জিগ্নেশের দলিত আন্দোলন, যার পিছনেও ছিল কংগ্রেসের অদৃশ্য হাতের সহায়তা। এই আন্দোলনের শুরুতেই গোহত্যার অভিযোগে কয়েকজন দলিতকে পিটিয়ে বিজেপির কর্মীদের অভিযুক্ত করা হয়। প্রকাশ্যে নিজেদের লক্ষ্য পরস্পরবিরোধী হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচনের সময় এই তিনটি গোষ্ঠীরই কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলানো ঘটনা প্রমাণ করে যে, কোনো দূরগামী উদ্দেশ্য নিয়েই শুরু করা হয়েছিল এই আন্দোলন। কট্টরপন্থী মুসলমানদের ভোট টানতে কাশ্মীরি কট্টরপন্থী মুসলমান সলমান নিজামিকে গুজরাটে ভোটের প্রচারে নামানো, খ্রিস্টান পাদরিকে দিয়ে কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার জন্য ফতোয়া জারি করানো বা নির্বাচনের আগে রাহুল গান্ধীর মন্দির দর্শন— এই সবই যে কেমব্রিজ এনালিটিকা নামক সংস্থার পেশাদারি পরামর্শের ফসল তা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেও কেমব্রিজ এনালিটিকার কাজের ধরন একটু পৃথক। এই সংস্থা কাজের শুরুতেই একটি রাজ্যের ফেসবুক-সহ সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল অধ্যয়ন করে এই রাজ্যের সরকার সম্পর্কে বা বিভিন্ন সরকারি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মানুষের মতামত বোঝার চেষ্টা করে। সরকার বিরোধীদের প্রোফাইলগুলির তালিকা তৈরি করে তাদের কাছে পেশাদারি ভিত্তিতে তৈরি হওয়া সরকার-বিরোধী বিভিন্ন বিষয় এমন ভাবে পাঠানো হয় যে ফেসবুক ও টুইটারের মাধ্যমে তারা যাতে শেয়ার করে। এই ভাবে সরকার-বিরোধী নানা অপপ্রচার সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ভাইরাল করানো হয়। কংগ্রেসের আই টি সেলে প্রায় এক হাজার জন পেশাদার নিযুক্ত আছে যারা ইচ্ছে করলে পাঁচ মিনিটে সরকার-বিরোধী মিথ্যে ছবি, পরিসংখ্যান, কাল্পনিক ভাবনা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করানোর ক্ষমতা রাখে।

শেষ মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গুজরাট নির্বাচন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়াতে কংগ্রেসের সমস্ত দীর্ঘমেয়াদি প্রয়াস, বিপুল পরিমাণ অর্থ সবই জলে গিয়েছে। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস এই কোম্পানিকেই বরাত দেবে বলে খবর। লোকসভা নির্বাচনের এখনো দেড় বছর বাকি। ফলে রাজস্থানে গুজ্জর আন্দোলন, হরিয়ানায় জাঠ আন্দোলন, গুজরাটে প্যাটেল আন্দোলন-সহ বিভিন্ন জাতপাত ভিত্তিক আন্দোলন, সেই সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যে দলিতদের পিটিয়ে মারা বা অত্যাচারের নানা ঘটনা, ফতোয়া জারি, গোরক্ষকদের তাণ্ডবের নামে হিন্দুবাদী শক্তিকে বদনাম করার মতো অকল্পনীয় সব ঘটনায় দেশ আরও একবার বারুদের স্তূপে পরিণত হতে চলেছে এমনটা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

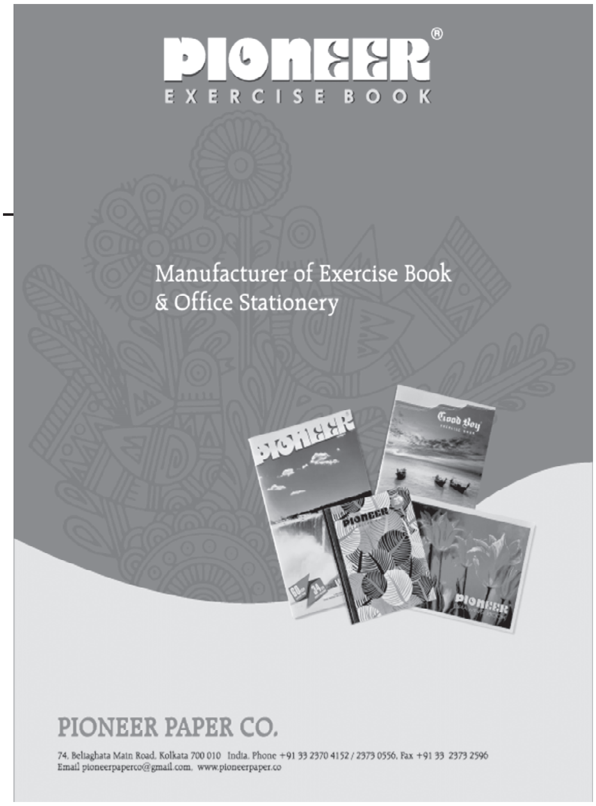

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

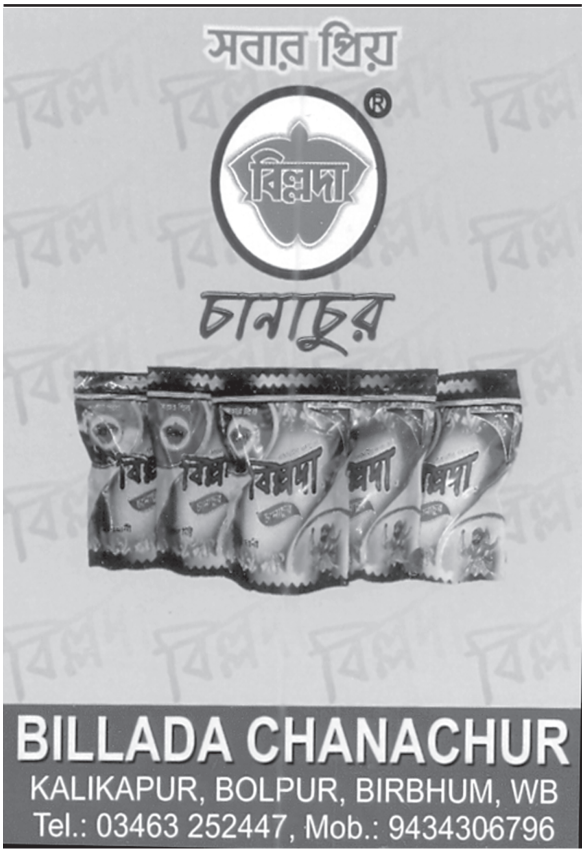

ফিরে দেখা -২০১৭

এক জাতি, এক দেশ, এক কর

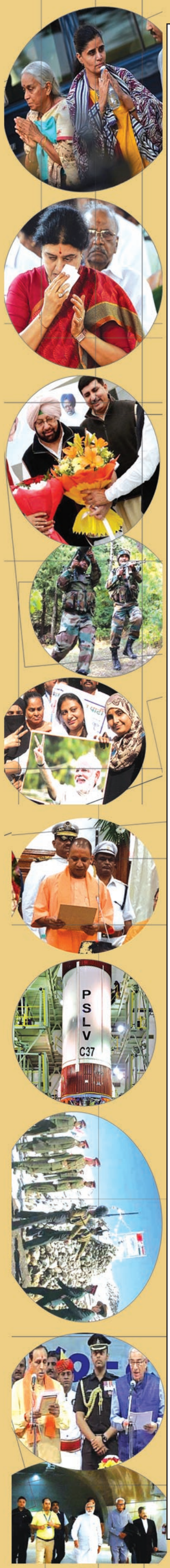

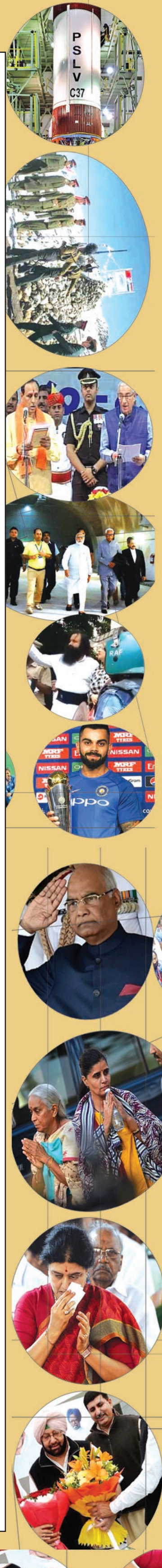

বিদায় নিল ২০১৭। ভারতবর্ষে একাধিক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছে এই বছর। যার মধ্যে অভিন্ন কর ব্যবস্থার প্রচলন, 'লোকসভায় তিন তালাক বিল পাশ, পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে ভারতের দ্বিতীয় সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, মহাকাশ বিজ্ঞান চর্চায় ইসরোর চমকপ্রদ সাফল্য ইত্যাদি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এরকমই কয়েকটি বিষয় নিয়ে স্বস্তিকার ফিরে দেখা : ২০১৭। সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যে সব বিষয় এবং ঘটনা জনমানসে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে সেগুলিই আলোচ্য। —স. স্ব.

সংসদের সেন্ট্রাল হলে জিএসটি-র উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, জিএসটি (গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স) হলো গুডস অ্যান্ড সিম্পল ট্যাক্স। সেইসঙ্গে এও বলেছিলেন, নতুন একটা ব্যবস্থা চালু হলে সাময়িকভাবে কিছু অসুবিধে হয়। তারপর আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যায়।

সেদিন প্রধানমন্ত্রী কিছু ভুল বলেননি। স্বাধীনতার পর কর ব্যবস্থায় এতবড়ো সংস্কার এই প্রথম। সেই হিসেবে একে ঐতিহাসিক সংস্কার বললেও অত্যুক্তি হয় না। জিএসটি চালু হবার আগে ভারতে ১৭টি কর এবং ২৩টি সেস প্রচলিত ছিল। এখন দেশে একটাই পরোক্ষ কর জিএসটি। সুতরাং দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা একটা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে একটা নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলার সময় কিছু অসুবিধা হয়ই। সাময়িক ভাবে অব্যবস্থাও দেখা দিতে পারে এবং মানুষকে কিছুদিনের জন্য হলেও তার ফল ভুগতে হয়। কিন্তু অন্যান্য দেশে মিডিয়া সরকারের পাশে দাঁড়িয়ে পরিবর্তনকে প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে। ব্যতিক্রম ভারতীয় মিডিয়া। জিএসটি চালু হবার পর থেকে ভারতের জাতীয় এবং আঞ্চলিক মিডিয়া মোদী সরকারের শুধু সমালোচনাই করেছে। অথচ ১৯৮৬ সালে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ যখন মডভ্যাট (এমওডিভিএট) চালু করেছিলেন তখনও মানুষের অসুবিধে হয়েছিল। এরপর বেশ কয়েকবার মডভ্যাটের সংস্কার হয়েছে। পরিবর্তিত কর-কাঠামোর জন্য মানুষ ভুগেছেন কিন্তু মিডিয়া বিশেষ মুখ খোলেনি।

শুধু মোদী সরকার যখন স্বাধীনোত্তর ভারতে সব থেকে বড়ো এবং সময়োপযোগী কর-সংস্কারে হাত দিল তখনই মিডিয়া গেল গেল রব তুলে বাজার গরম করতে নেমে পড়ল।

যদিও তাতে মিডিয়ার লাভ বিশেষ হয়নি। নোটবাতিলের সময় মানুষ সরকারের পাশে ছিলেন, জিএসটির পরেও আছেন। সাম্প্রতিক কয়েকটি বিধানসভা নির্বাচনে তার ফলও মিলেছে। এবং সরকারও তাদের ত্রুটিবিচ্যুতি যথাসম্ভব সংশোধন করে জিএসটিকে সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছে। ত্রুটি সংশোধনের একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে। জিএসটি চালু হবার পর কিছু জিনিসের (প্রি প্যাকেজড কমোডিটি) দাম হঠাৎ বেড়ে গিয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার এইসব জিনিসের জিএসটির হার হ্রাস করেছে। কর কমে যাওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবেই এখন দাম কমবে। উৎপাদিত পণ্যের লেবেলে পুরনো দামের ওপর নতুন দামের স্টিকার সেঁটে বিক্রি করতে পারবে উৎপাদক সংস্থাগুলি। অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি জানিয়েছেন ভবিষ্যতেও জিএসটি কাউন্সিলের সুপারিশ মেনে আরও কিছু পরিবর্তন করা হবে।

ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে মান্ধাতার আমলের কর ব্যবস্থার সংস্কার যে প্রয়োজন সে কথা বলাই বাহুল্য। জিএসটি সেই প্রয়োজন পূরণ করবে। আগে একই পণ্যে একাধিক কর লাগু হওয়ার ফলে ক্রেতাকে বেশি দাম দিয়ে পণ্য কিনতে হতো। জিএসটি চালু হওয়ার পর ক্রেতা একটাই কর দেবেন এবং করের ওপর কর দেওয়ার হাত থেকে মুক্তি পাবেন। আগে একটি পণ্য একাধিক ক্যাটেগরির আওতায় থাকার ফলে অযথা হয়রানির সম্মুখীন হতেন ক্রেতা। জিএসটি- পরবর্তী যুগে চালু হয়েছে হারমোনাইজড সিস্টেম অব নসেনক্লেচার, সংক্ষেপে এচি এস এন। এটি একটি আট সংখ্যা বিশিষ্ট কোড। কোনও একটি পণ্য গুণমানে কতটা আন্তর্জাতিক, তার ভিত্তিতে এই কোড দেওয়া হয়। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে ১৭ রকমের কর এবং ২৩ রকমের লেস দেওয়ার পরিবর্তে জিএসটি একটি সাধারণ কর ব্যবস্থার মধ্যে সারা দেশকে নিয়ে এসেছে।

সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২২ সালে উন্নত ভারতের যে স্বপ্ন দেশকে দেখিয়েছেন তার জন্য জিএসটি অনিবার্য। ভারত এখন এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। এই সময় এই ধরনের সাহসী পদক্ষেপই পারে নতুন যুগের সূচনা করতে। ■

ফিরে দেখা -২০১৭

চীনের চোখে চোখ, এই ভারত অন্য ভারত

ডোকলাম এক সময়ে ভুটানের গৃহপালিত ভেড়ার চরে খাবার জায়গা ছিল। সেই ডোকলাম নিয়ে ভারত ও চীনের মধ্যে অশান্তি শুরু হয়েছিল। যার পরিণতি ডোকলাম সীমান্তে দু' দেশের সেনাবাহিনীর চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে মাতৃভূমিকে রক্ষা করা। ২০১৭-র জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত সারা দেশ টেনশনের মধ্যে দিন কাটিয়েছে। তবে শেষ হাসি হেসেছে ভারত। চীনের চোখে চোখ রেখে বুঝিয়ে দিয়েছে যে ভারত যে কোনও হামলার জবাব দেবার জন্য তৈরি। এই কূটনৈতিক জয় নরেন্দ্র মোদীর বিদেশনীতিকে এমন এক উচ্চতায় প্রতিষ্ঠা করেছে যেখান থেকে টেনে নামানো আদপেই সম্ভব নয়।

অশান্তির সূত্রপাত ১৬ জুন। ডোকলাম মালভূমি অঞ্চলে চীনের রাস্তা তৈরির প্রয়াসে এদিন ভারত বাধা দেয়। কারণ ওই রাস্তা তৈরি হলে ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতো। বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ভারতের। অতঃপর চীনা সৈন্য ডোকলাম সীমান্তে টহল দিতে শুরু করে। ২০ জুন ভারতে নিযুক্ত ভুটানের রাষ্ট্রদূত সে দেশে বেআইনি চীনা সৈন্য অনুপ্রবেশের কথা দিল্লিকে জানায়। ২৩ জুন চীন এক নিষেধাজ্ঞা জারি করে বলে, এ বছর (২০০৭) হিন্দু বৌদ্ধ এবং জৈন তীর্থযাত্রীরা কৈলাস এবং মানস সরোবরে যেতে পারবে না। কারণ দেখায় অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে তিব্বতের রাস্তাঘাট নাকি খারাপ হয়ে গেছে। ২৮ জুন ভারতীয় স্থলবাহিনীর প্রধান বিপিন রাওয়াত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য সিকিমে যান। ২৯ জুন চীন-ভারত সীমান্তের কাছাকাছি একটি ৩৫ টন ওজনের ট্যাঙ্ক পরীক্ষা করে। ৬ জুলাই জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে জি জিনপিং এবং নরেন্দ্র মোদীর বৈঠক চীন বাতিল করে দেয়। কারণ দেখায় পরিস্থিতি নাকি দুই রাষ্ট্রপ্রধানের সাক্ষাতের উপযোগী নয়। ১৮ জুলাই এক চীনা আধিকারিক তাঁর বিবৃতিতে বলেন, পরিস্থিতি আরও খারাপ হবার আগেই ভারতের সেনা প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিত। নীতিগত কারণেই ডোকলামে ভারতের অনুপ্রবেশ করা উচিত নয়। উল্লেখ্য, ভারতীয় সেনা নিজের দেশের সীমান্তেই মোতায়েন ছিল। তারা কোথাও অনুপ্রবেশ করেনি। ১৯ জুলাই সমাজবাদী নেতা মুলায়ম সিংহ যাদব বললেন, চীন পাকিস্তানে প্রভূত পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র মজুত করেছে। উদ্দেশ্য, ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ। ২২ জুলাই পেন্টাগণ এক বিবৃতিতে বলল, ভারত চীন কারোরই হঠকারী কিছু করা উচিত নয়। ২৭ জুলাই বর্ধমানের পানাগড়ের এয়ারফোর্স স্টেশনে প্রথম মাল্টি স্কিলড ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফট সি-১৩০ জে সুপার হারকিউলিস এসে নামল। সারা দেশ ভাবল এবার বুঝি যুদ্ধ শুরু হবে। কিন্তু আধিকারিকেরা জানিয়ে দিলেন, এর সঙ্গে ডোকলামের কোনও সম্পর্ক নেই। ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল তখন চীনের স্টেট কাউন্সেলর ইয়াং জিয়েচির সঙ্গে দু' দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত। ৩১ জুলাই চীনের লালফৌজ ভারতীয় ভূখণ্ডের এক কিলোমিটার ভেতরে চলে এল। মেষপালকদের কপালে জুটল শাসানি। ৩ আগস্ট দিল্লিতে চীনা দূতাবাসের এক আধিকারিক বলেন, এখনই সেনা প্রত্যাহার না করলে ভারতকে তার শোচনীয় ফল ভুগতে হবে। ওইদিনই বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ রাজ্যসভায় বলেন, যুদ্ধ কোনও সমস্যার সমাধান নয়।

এই সময় চীন নিয়মিত হুমকি দিচ্ছিল। ১৭ আগস্ট চীনের সরকার পরিচালিত সংবাদমাধ্যম জিনহুয়া একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করে। যার বিষয়, ভারতের সাতটি অপরাধ। যার মধ্যে রয়েছে ভারতের আন্তর্জাতিক আইন অমান্য, ডোকলাম ইস্যুতে ভালোমন্দ গুলিয়ে ফেলা ইত্যাদি। কোনও কিছুতেই ভারত চাপের মুখে ভেঙে পড়েনি। শেষে যখন ব্রিক্স সম্মেলনের সময় এগিয়ে এল এবং চীন বুঝল যে তারা মারাত্মক ফাঁদে পড়েছে তখন সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলো। কারণ ডোকলামে চীনা আগ্রাসনের অভিযোগে নরেন্দ্র মোদী যদি ব্রিকসের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতেন তা হলে চীনের ভাবমূর্তি সারা পৃথিবীতে যথেষ্টই ক্ষুণ্ণ হতো। যাই হোক, ২৮ আগস্ট দু' দেশে সেনা প্রত্যাহার করে নিল।

এই ঘটনা ভারতের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকবে। ১৯৬২-তে লজ্জার হারের পর সামরিক বিচারে ভারত চীনের সামনে মাথা ঝুঁকিয়েই থাকত। ২০১৭-তে নরেন্দ্র মোদী সেই নীচু মাথা অনেকখানি উঁচু করে দিয়েছেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ■

ফিরে দেখা -২০১৭

তালাকের অন্ধকার থেকে আলোর পথে

নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের 'মানবিক মুখ' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে তিন তালাক বিল। যদিও এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত কংগ্রেস এবং আরও কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানসিকতা সম্পন্ন দলের বদান্যতায় বিলটি রাজ্যসভায় অনুমোদিত হতে পারেনি কিন্তু শুধুমাত্র প্রয়াসের জোরেই নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর সরকার অসংখ্য মুসলমান মহিলার হৃদয়ে জায়গা করে নেবেন।

ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস এবং তাদের লেজুড় বামপন্থী দলগুলি মুসলমান জনতাকে শুধুমাত্র ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে দেখে। মানুষ হিসেবে নয়। যার ফলে মুসলমান সমাজের একটা বড়ো অংশ মৌলবাদী জঙ্গিতে পরিণত হলেও তাদের কিছু যায় আসে না। একদিকে মুসলমান তোষণ এবং অন্যদিকে হিন্দুদের বিভাজন— মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেশে ফিরে আসার পর থেকে ভারতবর্ষ কংগ্রেসকে এই দুই ভূমিকায় দেখেই অভ্যস্ত। সাধারণ মুসলমান যত পিছিয়ে পড়ে ততই ইসলামি ধর্মতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির লাভ। একমাত্র তাতেই মোল্লা-মৌলবিদের দিয়ে সাধারণ মুসলমানকে ভুল বুঝিয়ে ব্লক ভোটিংয়ের মাধ্যমে বার বার ক্ষমতায় ফিরে আসা সম্ভব।

দেশের সৌভাগ্য, বিজেপি প্রকৃত অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ দল। যে কারণে কয়েকশো বছর ধরে চলতে থাকা তাৎক্ষণিক তিন তালাকের অভিঘাতে বিপর্যস্ত মুসলমান মহিলাদের দুঃখ অনুভব করতে নরেন্দ্র মোদীর কোনও অসুবিধে হয়নি। তাঁর সাহস এবং সদিচ্ছা পুরস্কৃত হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। সারা দেশ দেখেছে মুসলমান মহিলাদের হাসিমুখের ছবি। লোকসভায় পাশ হওয়ার পর তিন তালাক বিল এখন রাজ্যসভার অনুমোদনের অপেক্ষায়। কতদিনে সেটি হয় তারই অপেক্ষায় এখন ভারতবর্ষ।

মহাকাশ গবেষণায় নতুন দিগন্ত

এক সময় অনেকেই আক্ষেপ করতেন সরকারি ঔদাসীন্যের ফলে ভারতের মহাকাশ গবেষণা কাঙ্ক্ষিত উচ্চতায় পৌঁছয় না। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর মহাকাশ গবেষণার বিষয়টি অবহেলা করেননি। যার ফল ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশনের (ইসরো) একের পর এক সাফল্য। ২০১৭ সালটিতে ইসরো পিএস এল ভি-সি ৩৭ মহাকাশযানে ১০৪টি উপগ্রহ মহাকাশে পাঠায়। এটি একটি বিশ্বরেকর্ড। এর আগে আর কোনও দেশের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা একসঙ্গে এতগুলো উপগ্রহ পাঠাতে পারেনি। এছাড়া ২০১৭ ইসরোর জিয়োসিনক্রোনাস স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল— এম কে-৩ (সংক্ষেপে, জিএসএলবি-এম কে-৩) মহাকাশে পাঠানোর বছর। ইদানীং পৃথিবী পর্যবেক্ষণকারী উপগ্রহের আকৃতি ছোট করার প্রয়োজনীয়তা সব দেশই অনুভব করছে। ইসরোর উদ্যোগে এবং তত্ত্বাবধানে ভারত ইতিমধ্যেই আকারে ছোট এবং ওজনে হালকা— এরকম রকেট তৈরি করা শুরু করেছে। এর উদ্দেশ্য হালকা ওজনের (৫০০ কেজি পর্যন্ত) উপগ্রহ বহন করা। অপেক্ষাকৃত কম উন্নত দেশগুলির উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করার জন্য উন্নত দেশগুলি তাদের রকেট ভাড়া দেয়। ভারত এখন সেইসব উন্নত দেশের মধ্যে নিজেকে শামিল করতে চায়। জুনে ইসরো আবার মহাকাশে রকেট পাঠাল, সেই রকেটে মহাকাশে উৎক্ষেপণের জন্য প্রেরিত হলো ভারতের ক্যার্টোস্যাট ন্যানো এবং নিউস্যাট উপগ্রহ-সহ ১৪টি বিভিন্ন দেশের ২৯টি উপগ্রহ। ইসরোর সাফল্যে উদ্বুদ্ধ নরেন্দ্র মোদী সার্ক গোষ্ঠীযুক্ত দেশগুলির জন্য বিশেষভাবে উপযোগী উপগ্রহ তৈরি করতে বলেছেন। সব দেশই এই উদ্যোগকে স্বাগত জানালেও পাকিস্তান বলেছে ভারতের সাহায্য তাদের দরকার নেই।

নিয়ন্ত্রণ রেখা পেরিয়ে পাক-কাশ্মীরে ভারতীয় সেনা

ডিসেম্বরের ২৩ তারিখে সংঘর্ষবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে পাকিস্তান হামলা চালিয়েছিল। মারা যান ভারতীয় সেনার একজন মেজর ও তিনজন জওয়ান। কিন্তু ভারত মুখ বুজে অন্যায় মেনে

নেয়নি। পাকিস্তানের হামলার ঠিক ২৪ ঘণ্টা পর ভারতীয় সেনা নিয়ন্ত্রণ রেখা পেরিয়ে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে প্রত্যাঘাত করে। মারা যায় তিনজন পাকিস্তানি সেনা। একজন গুরুতরো আহত হয়। আগেকার দিন হলে ভারত বড়জোর দু-একটা নরম-গরম বিবৃতি দিত। কিন্তু মোদী সরকারের প্রতি আক্রমণ নির্ভর কৌশলের ফলে পাকিস্তান এখন বেকায়দায়। তারা বুঝে গেছে ইট ছুঁড়লে পাটকেলটিও খেতে হবে।

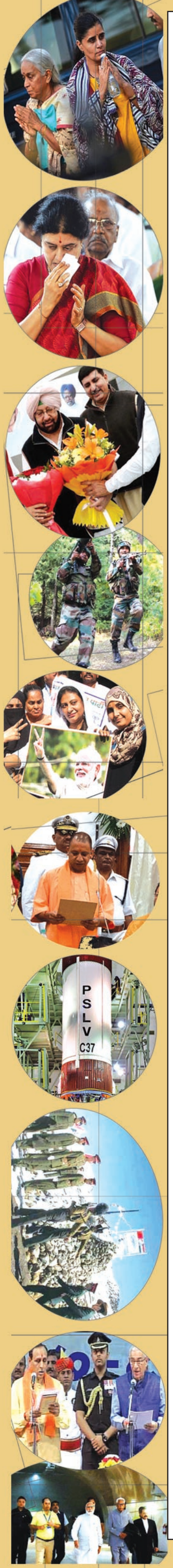

ফিরে দেখা -২০১৭

দেশের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষায় সফল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক

২০১৭ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাজের তালিকা দীর্ঘ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দেশের পুলিশ বাহিনীর আধুনিকীকরণ। এছাড়া, অপরাধ এবং অপরাধীদের বিষয়ে একটা ট্র্যাকিং নেটওয়ার্ক ও সিস্টেম-এর কাজের পরিধি বাড়ানো হয়েছে। এর জন্য ২০২২ সাল পর্যন্ত ২ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। পুলিশ বাহিনীর কাজের আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে একটি ডিজিটাল পুলিশ পোর্টাল চালু করা হয়েছে। এই পোর্টালের মাধ্যমে ফৌজদারি বিচার-ব্যবস্থার অধীনে কর্মরত বিভিন্ন দপ্তরকে অখণ্ড তথ্য ভাণ্ডারের আওতায় নিয়ে আসা হবে। এই পোর্টালের মাধ্যমে নাগরিকরা অনলাইনে এফআইআর দায়ের করতে পারবেন এবং সারা ভারতের যে কোনও জায়গার অপরাধীদের অপরাধের ইতিহাস সংক্রান্ত তথ্য এই পোর্টাল থেকে পাওয়া যাবে।

অস্ত্রশস্ত্র তৈরির ক্ষেত্রে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচিকে সফল করতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক অস্ত্র সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন সরলীকরণ করেছে। এ বছরই সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর বিমান শাখায় নিজস্ব পাইলট এবং বিমান কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা হয়েছে। চলতি বছরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বাম উগ্রপন্থা-অধ্যুষিত রাজ্যগুলির সমস্যা পর্যালোচনা করা হয়েছে। মে মাসের ৮ তারিখে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এই ধরনের ১০টি রাজ্যের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক বৈঠকে 'সমাধান' নামে একটি রণকৌশল নির্ধারণ করেছেন। বাম উগ্রপন্থা-অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে যোগাযোগ বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ব্যাঙ্কিং-এর বর্ধিত সুবিধার মাধ্যমে উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আগস্ট মাসে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সংসদীয় কমিটির বৈঠকে জানিয়েছেন যে, দেশে ২০১০-১৬'র মধ্যে হিংসাত্মক ঘটনা ৫৩ শতাংশ কমেছে। ২০১৭-তেও এই প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো'র প্রাক্তন অধিকর্তা দীনেশ্বর শর্মাকে জম্মু-কাশ্মীরে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনার জন্য প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেপ্টেম্বর মাসে ৪ দিনের জন্য জম্মু ও কাশ্মীর সফর করেন। এই রাজ্যের তিনটি অঞ্চলের সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচির কথাও তিনি ঘোষণা করেন। সীমান্তে সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘনের ফলে নিহতদের জন্য ক্ষতি পূরণের অর্থ ১ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরে সিআরপিএফ-এর পক্ষ থেকে নাগরিকদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য একটি হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ এপ্রিল মাসে নতুন দিল্লিতে আন্তঃরাজ্য পরিষদে বৈঠকের পৌরোহিত্য করেন। এই বৈঠকে 'পুঞ্চি কমিশন'-এর রিপোর্ট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন দ্বীপভূমি উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন দিল্লিতে জুলাই মাসে দ্বীপ উন্নয়ন এজেন্সি গঠন করা হয়েছে। এই এজেন্সির বিভিন্ন বৈঠকে ভারতের ৯টি দ্বীপাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। দেশের কোনও বেসরকারি সংস্থা যাতে বিদেশ থেকে পাওয়া অর্থের অপব্যবহার না করতে পারেন, তার জন্য ফরেন কন্ট্রিবিউশন (রেগুলেশন) অ্যাক্ট অনুসারে সরকারের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য ১ হাজারেরও বেশি বেসরকারি সংস্থাকে বিদেশ থেকে দান গ্রহণের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এ বছরের মে মাসে জাতীয় পর্যায়ের এক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতে বিপর্যয়ের ঝুঁকি কমিয়ে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে কী করা উচিত, তা নিয়ে বৈঠকে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। এ বছরের অক্টোবর মাসে নতুন দিল্লিতে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ-এর সদর দপ্তরের উদ্বোধন করা হয়েছে। কাশ্মীর-সহ দেশের বিভিন্ন অংশে বাইরের দেশ কর্তৃক সন্ত্রাসবাদে উৎসাহ দেওয়ার বিরুদ্ধে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা সম্প্রতি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নিয়েছে। রাজ্যের পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী শাখাগুলির কাজকর্মকে আরও জোরদার করে তুলতে এবং তাদের কর্মীদের আরও সুদক্ষ করে তুলতে পশ্চিমাঞ্চলের একটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রাজস্থানের যোধপুরে উদ্বোধন করা হয়েছে।

ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দু'দেশের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। নভেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনদিনের রাশিয়া সফরের সময় এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দু'দেশের মধ্যে অপরাধ দমন বিষয়ে একটি যৌথ কর্মপরিকল্পনা বিষয়েও একটি সমঝোতা

স্বাক্ষরিত হয়।

জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় সাংহাই সহযোগিতা সংগঠনের দেশগুলির এক বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ বছরের আগস্ট মাসে যোগ দেন। কিরঘিজ প্রজাতন্ত্রের আটা শহরে ভারত'কে এই গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে ধন্যবাদ জানান। এই দেশগুলির মধ্যে ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় একটি উদ্যোগ নেওয়ার জন্য ভারতের পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাব দেওয়া হয়।

ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিষয়ে এ বছরের জুন মাসে একটি সহযোগিতা সংক্রান্ত স্মারকপত্র কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় অনুমোদিত হয়েছে। এর ফলে, দু'দেশের মধ্যে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার পথ প্রশস্ত হবে। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য ও ভারতের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ ও সাইবার অপরাধ মোকাবিলা বিষয়ে এ বছর এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। ২০১৭-র মে মাসে দু'দেশের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা বৈঠক হয়েছে। জুলাই মাসে লন্ডনে এ বিষয়ে দ্বিতীয় বৈঠকে দু'দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে মতবিনিময় হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গেও সন্ত্রাসবাদ, সাইবার অপরাধ এবং বেআইনি আর্থিক লেনদেন মোকাবিলায় সহযোগিতার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিমস্টেক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির এক বৈঠকে বিপর্যয় মোকাবিলায় সহযোগিতা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে পুলিশ প্রশিক্ষণ ও তাঁদের কাজের উন্নয়নের বিষয়ে টেকনিক্যাল সহযোগিতা সংক্রান্ত একটি সমঝোতা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় সম্প্রতি অনুমোদিত হয়েছে। ভারত ও থাইল্যান্ডের মধ্যে মাদক চালান, বন্যপ্রাণী চালান প্রভৃতি বিষয় নিয়ন্ত্রণে দু'দেশের মধ্যে একটি সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়েছে। মিয়ানমারের সঙ্গেও এ বছরের জুলাই মাসে অনুরূপ ক্ষেত্রে সহযোগিতার লক্ষ্যে আলাপ-আলোচনা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ সম্প্রতি ভারত-বাংলাদেশ ও ভারত-চীন সীমান্ত সংলগ্ন রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে দুটি পৃথক বৈঠক করেছেন। এর মধ্যে ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠকে একটি সীমান্ত সুরক্ষা গ্রিড স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। ভারত ও মিয়ানমারের মধ্যে সীমান্ত বিষয়ে সেদেশের সীমান্ত সংলগ্ন রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে এক বৈঠকে সীমান্ত সংলগ্ন এলাকার উন্নয়নের কর্মকাণ্ড নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। কোহিমা ও ডিমাপুরে মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মহিলা থানা গড়ে তোলা হচ্ছে। নভেম্বর মাসে স্বরাষ্ট্র সচিব দেশে ৮টি গুরুত্বপূর্ণ শহরের মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেছেন।

চলতি বছরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নভেম্বর মাসে আর্থিক ক্ষেত্রে সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থাদি নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। ডিসেম্বর মাসে তিনি শত্রু সম্পত্তি আইন, ২০১৭'র নতুন সংস্থানগুলির রূপায়ণে ব্যবস্থা নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। যেসব জওয়ান ও সেনাকর্মী দেশের নিরাপত্তার জন্য জীবন বিসর্জন দিয়েছেন, তাঁদের আর্থিক সহায়তার লক্ষ্যে 'ভারতকে বীর' নামে একটি ওয়েবপোর্টাল চালু করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনীর কর্মীদের অভিযোগ নিষ্পত্তিকল্পে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন চালু করা হয়েছে। এঁদের কল্যাণ ও পুনর্বাসনের জন্যও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পক্ষ থেকে 'ডব্লুএআরবি' নামে একটি মোবাইল অ্যাপ চালু করা হয়েছে। দিল্লি পুলিশের উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার আওতায় 'যুবা' নামে একটি দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি এ বছর চালু করা হয়েছে। সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে তাদের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী এবং সীমান্ত এলাকায় বসবাসরত মানুষদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নিগমের সঙ্গে একটি সমঝোতা এ বছর স্বাক্ষরিত হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে যেসব খবরের ভিত্তিতে মাদক ও এই ধরনের বেআইনি জিনিসপত্র ধরা পড়ে, তার জন্য পুরস্কার প্রদানের নতুন নীতি-নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। ■

এই সময়

ট্যাক্সিতে ৬০০

নরওয়ের এক ব্যক্তি কোপেনহেগেনে পার্টি করছিলেন। প্রায় ভোররাতে বাড়ি ফিরবেন

বলে তিনি একটি ট্যাক্সি ভাড়া করেন। যাবেন অসলো। দূরত্ব ৬০০ কিমি। সওয়ারির নির্দেশ মেনে ড্রাইভার সুইডেন এবং ডেনমার্ক ঘুরে অসলো (নরওয়ে) পৌঁছয়। আন্তর্জাতিক সীমা লঙ্ঘন করার জন্য ওই ব্যক্তির ২০০০ ডলার জরিমানা হয়েছে।

লগনচাঁদা

কুকরটির নাম জোয়ে। সেটি পেনিসিলভেনিয়ার মণিকা নেওহার্ডের পোষা কুকুর। ২ জানুয়ারি একটি ঈগল জোয়েকে তুলে নিয়ে যায়। ভাগ্য ভাল বলতে হবে, ঈগলটি জোয়েকে বেশি দূর নিয়ে যেতে পারেনি। জোয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে। ভালো আছে।

অন্য মা

কাইল জাউরেগুই আরিজোনার একটি বেকারিতে তাদের অর্ডার দেওয়া কেকের

ডেলিভারি নিতে গিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল। কারণ কেকটির দাম আগেই কেউ একজন দিয়ে গেছেন। একটি চিরকুটে মিলল তার পরিচয়। তিনিও মা। তাঁর মেয়ে ম্যাককিনা মারা গেছে। সেদিন ছিল ম্যাককিনার দশম জন্মদিন। মেয়ের কথা ভেবেই তিনি কাইলের কেকের দাম দিয়েছেন।

সমাবেশ -সমাচার

কল্যাণ আশ্রমের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সাংস্কৃতিক সম্মেলন

গত ২৫ ডিসেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনা কল্যাণ আশ্রমের জেলা সাংস্কৃতিক সম্মেলন হয় গোসাবা ব্লকের বিপ্রদাসপুর অঞ্চলের মন্মথ নগর প্রীতিলতা ছাত্রীনিবাসে। জেলার ৬টি ব্লক থেকে ৭০ জন আচার্যা, ১২০ জন শিল্পী এবং কয়েকজন কার্যকর্তা সম্মেলনে যোগদান করেন। প্রধান বক্তা ছিলেন পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের দক্ষিণবঙ্গের প্রান্ত-সহ সংগঠন সম্পাদক উত্তম মাহাত। পৌরোহিত্য করেন তৎসঙ্গ যোগাশ্রমের ওঙ্কারানন্দজী মহারাজ। আশ্রমের ছাত্রীরা লালপেড়ে সাদা শাড়ি পরিধান করে শঙ্খ, ঝম্প, মাদল,

কাঁড়া-নাকড়া বাজিয়ে বিদ্যাধরী নদীর জল ঘটে নিয়ে সারিবদ্ধভাবে মঞ্চে এসে অনুষ্ঠানের সূচনা করে। পরে ভারতমাতা, শ্রীরামচন্দ্র ও বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা-পুরুষ বালাসাহেব দেশপাণ্ডের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি ওঙ্কারানন্দজী, প্রধান অতিথি সন্তোষ কুমার বর্মন ও প্রবীণ শিক্ষক প্রভাস চন্দ্র বর্মন, উত্তম মাহাত প্রমুখ। প্রীতিলতা ছাত্রী নিবাসের ছাত্রীরা উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে। প্রাস্তবিক ভাষণে বালাসাহেব দেশপাণ্ডের জীবনী ও পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব এবং সুন্দরবনের মন্মথ নগরে ছাত্রীনিবাস গড়ে তোলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেন জেলা পরিচালন কমিটির সম্পাদক কিন্নরাম সরদার, বকুল চন্দ্র গায়েন, কোষাধ্যক্ষ সিদ্ধেশ্বর বৈদ্য, জেলা সম্পাদক অমল মুণ্ডা, সঞ্জয় মণ্ডল প্রমুখ। মহিলা উপপুঞ্জ প্রমুখ শ্যামলী মাহাত, প্রীতিলতা ছাত্রী নিবাসের কর্মাধ্যক্ষা রেবতী মণ্ডল মেধাবী ছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সংস্কৃতি চর্চা অনুষ্ঠানে ১২০ জন শিল্পী ও ৫টি ঝুমুর দল অংশগ্রহণ করে। কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পরেশ চন্দ্র মণ্ডল।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে যোগাসন প্রতিযোগিতা

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শ্রীনাথ সভাঘরে ১৩তম সারা রাজ্য যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয় গত ২৩ ও ২৪ ডিসেম্বর। কলকাতা ও অন্যান্য জেলা থেকে ১৫০০ প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। সহযোগিতায় ছিল বিশিষ্ট যোগাসনবিদ উজ্জ্বল ঘোষের পরিচালনাধীন এশিয়ান যোগ রিসার্চ ইন্সটিটিউট। যোগাসন ছাড়াও ছিল দেহসৌষ্ঠব প্রতিযোগিতা। যোগের প্রতিটি ছন্দ ও মাত্রাকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে প্রশিক্ষিত শিশু-কিশোর-কিশোরী। সব মিলিয়ে সেরা পারফরমেন্স তুলে ধরেছে কাকদ্বীপের যোগ

এই সময়

যমজ

ক্যালিফোর্নিয়ার মারিয়া এসপারেনজা ফ্লোরস রিও যমজ শিশুর জন্ম দিয়েছেন। দুজনের

বয়সের ব্যবধান মাত্র আঠারো মিনিট। কিন্তু একজনের জন্মসাল ২০১৭ এবং অন্যজনের ২০১৮। হাসপাতালের চিকিৎসক জানিয়েছেন এরকম ঘটনা তিনি কখনও দেখেননি।

শীতে বিপদ

বরফে পিচ্ছিল রাস্তা দিয়ে উচ্চ গতিতে গাড়ি চালাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলেন

চালক। এক পুলিশ অফিসার ভাগ্যক্রমে দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে যান। টেক্সাসের হারস্ট পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়, 'পিচ্ছিল রাস্তায় জোরে গাড়ি চালাবেন না।

কাহিল পেঙ্গুইন

পেঙ্গুইন শীতপ্রধান অঞ্চলেই থাকে। অথচ এবার কানাডায় এমনই শীত পড়েছে যে

কালগারি চিড়িয়াখানায় পেঙ্গুইনের দলও নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছে। কেমন শীত কানাডায়? আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে--- ৩০° সেলসিয়াস। এই তথ্য ৩১ ডিসেম্বরের।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। প্রতিযোগিতায় সিনিয়র ও জুনিয়র বিভাগে সেরা হয় যথাক্রমে স্বামী প্রণবানন্দ ও এশিয়ান যোগ ট্রফি লাভ করেন ইন্দ্রনীল চৌধুরী ও প্রেমকুমার দাস। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন যোগ বিশারদ প্রেমসুন্দর দাস উপস্থিত থেকে প্রতিযোগীদের উৎসাহ দান করেন। গোটা প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মহারাজরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। রাজ্যের বৃহত্তম যোগাসন প্রতিযোগিতা উপলক্ষে হাজির ছিলেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, আইপিএস ভিপি তারানিয়া। পুরস্কার বিতরণ করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ। বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যোগ বিশেষজ্ঞ স্বামী দিব্যজ্ঞানানন্দ মহারাজ।

চিত্তরঞ্জনে রাষ্ট্রীয় পাঠক মঞ্চের সভা

গত ৩১ ডিসেম্বর চিত্তরঞ্জন শহরে রেল আবাসনের প্রেক্ষাগৃহে 'রাষ্ট্রীয় পাঠক মঞ্চের' উদ্যোগ পাঞ্চজন্য, অর্গানাইজার ও স্বস্তিকা পত্রিকার পাঠক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রেল শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট অধিকারী-সহ ২৫০ জন নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। পারিবারিক মিলন সন্ধ্যায় স্বস্তিকা, পাঞ্চজন্য, অর্গানাইজার পত্রিকার পাঠকরা পত্রিকার ভালমন্দ বিষয়ে মতামত জানান। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পাঞ্চজন্য পত্রিকার সম্পাদক হিতেশ

শংকর, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ-প্রচার প্রমুখ নরেন্দ্র ঠাকুর, দক্ষিণবঙ্গের প্রান্ত কার্যবাহ ড. জিষ্ণু বসু, প্রান্ত সম্পর্ক প্রমুখ বিপ্লব রায়, স্বস্তিকার পক্ষ থেকে সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র বৌদ্ধিক প্রমুখ ড. তিলক রঞ্জন বেরা। শ্রী শংকর ও শ্রী ঠাকুর উভয়েই রাষ্ট্রীয় ভাব প্রচারে এইসব পত্রিকার বিশেষ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন।

হুগলী জেলা পৌরোহিত্য প্রশিক্ষণ শিবির

হুগলী জেলার শ্রীপুর বাজার, বলাগড়ের সচ্চিদানন্দ সেবাশ্রমে ভারত সংস্কৃত পরিষদের পরিচালনায় গত ১৭ থেকে ১৯ ডিসেম্বর ৩ দিনের একটি দশকর্মা বিষয়ক পৌরোহিত্য প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজার প্রাক্কালে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দুর্গাপূজা বিষয়ক পৌরোহিত্য প্রশিক্ষণ শিবির হয়েছিল। শিক্ষার্থীদের আগ্রহে ৮ থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত কালীপূজা ও জগদ্ধাত্রী পূজা বিষয়ক পৌরোহিত্য প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন হয়েছিল। পুনরায় শিক্ষার্থীদের অনুরোধে দশকর্মাবিষয়ক যথা— বিবাহ, শ্রাদ্ধ ও উপনয়ন বিষয়ে পৌরোহিত্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। শিবিরে ৪০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন ১০টি জেলা থেকে। ১৫ জন শিক্ষার্থী আবাসিক ছিলেন। গীতা, চণ্ডী, পূজার মন্ত্রের সঠিক উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রশিক্ষক ছিলেন পণ্ডিত শক্তিপদ চক্রবর্তী, পণ্ডিত সুজিত কুমার মুখার্জী, পণ্ডিত দিলীপ কুমার পালাধি ও আচার্য কমলাকান্ত।

এই সময়

কর্ণাটকে গুণ্ডারাজ

কর্ণাটকে আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। সম্প্রতি এই অভিযোগ করেছেন

রাজ্যের বিজেপি প্রধান বি.এস. ইয়েদুরাপ্পা। সুরাতকালে বজরং দলের কর্মীদের ওপর পুলিশি অত্যাচারের প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, কর্ণাটক সরকার কেরলের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে।

মক্কেলের পর উকিল

তিন তালাক আন্দোলনের প্রতিবাদী মুখ ইশরাত জাহান আগেই বিজেপিতে যোগ

দিয়েছিলেন। সম্প্রতি তার উকিল নাজিয়া ইলাহি খানও বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। তার যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দিলীপ ঘোষ এবং মুকুল রায়।

বিধর্মে অসহিষ্ণু

ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু— এরকম কয়েকটি দেশের যে তালিকা প্রস্তুত করেছে আমেরিকা, তার মধ্যে পাকিস্তানও

রয়েছে। এইসব দেশের ওপর বিশেষ নজরদারি চালাবে আমেরিকা। উল্লেখ্য, পাকিস্তানে অনেকদিন ধরেই হিন্দুরা অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার।

সমাবেশ -সমাচার

‘যুগল কিশোর জৈথলিয়া’ সংখ্যার উন্মোচন

‘ভাবনাকে কাজে পরিণত করার প্রতীকপুরুষ ছিলেন যুগলজী। মন্ত্রের মতো পবিত্র ছিল তাঁর জীবন। চিন্তন ও ক্রিয়ান্বয়নের সংবাহক ছিলেন তিনি। রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য কিছু করার সংকল্প ও প্রেরণা তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের থেকে পেয়েছেন।’ গত ৩০ ডিসেম্বর কলকাতার অসোয়াল ভবনে দিল্লি থেকে প্রকাশিত হিন্দি সাপ্তাহিক পাঞ্চজন্য

পত্রিকার যুগল কিশোর জৈথলিয়া সংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠানে কথাগুলি বলেন পাঞ্চজন্য পত্রিকার সম্পাদক হিতেশ শঙ্কর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সজ্জন কুমার তুলসীয়ান। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন প্রকাশ বৈতালা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী। অনুষ্ঠানের শুরুতে শুভম্ উপাধ্যায় ‘ভারতী মাঁ কে উপাসক, মাতৃমন্দির কে পূজারি’ একক গীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীমতী স্নেহলতা বৈদ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পুস্তকালয়ের সম্পাদক মহাবীর বজাজ। কলকাতা ও হাওড়া মহানগরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

বর্ধমানে ‘জনজাতি সাংস্কৃতিক’ সম্মেলন

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের উদ্যোগে গত ২৪ ডিসেম্বর পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার সম্মিলিত ‘জনজাতি সাংস্কৃতিক’ সম্মেলন হয়। পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাঁকসা ব্লকের

আমানিডাঙ্গা ‘আদিবাসী ক্লাবে’র মাঠে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী বক্তব্যে আশীর্বাণী প্রদান করেন দুর্গাপুর ইস্কন মন্দিরের পূজ্যপাদ সোনার চৈতন্য প্রভু। সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, প্রধান বক্তা রূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে স্থানীয় রামকৃষ্ণ স্কুলের শিক্ষক মদন শুকুল, পূর্ব ও উত্তর-মধ্য ক্ষেত্রের জনজাতি হিত রক্ষা প্রমুখ অজয় সিংহ, ‘মাতকমবুটু উতনো সামলে’ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা গণেশ চন্দ্র, পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের দক্ষিণবঙ্গ সংগঠন সম্পাদক মহাদেব গড়াই। তাঁরা আশ্রম সম্বন্ধে তাঁদের সুচিন্তিত বক্তব্য তুলে ধরেন। দুই জেলার ১০টি জনজাতি অধ্যুষিত ব্লক হতে ৫৫টি নৃত্যদল অনুষ্ঠানে পারম্পরিক বেশে নৃত্য পরিবেশন করে। এই সম্মেলনে মোট ৫ হাজার জন উপস্থিত ছিলেন।

ভারতের বৃদ্ধির ঊর্ধ্বমুখী রেখাচিত্রে নতুন বছরে আশার আলো

অতিথি কলম

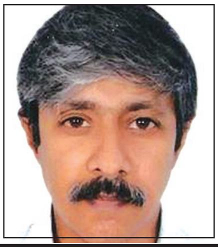

রাজীব দেশপাণ্ডে

২০১৭-র শুরুতে উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনের জয় দিয়ে যে অভিযানের শুরু হয়েছিল বছরের শেষে গুজরাটের নির্বাচনী জয়ের ধারায় তার উৎসাহব্যঞ্জক পরিসমাপ্তি ঘটল। সারা বছরের ধারাবাহিক রাজনৈতিক কার্যক্রমের এটি কাঙ্ক্ষিত পরিণতি। এদিকে ২০১৮-এর যবনিকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের আড়াআড়ি ভাগ হয়ে থাকা দু'টি দলেরই জন্য রয়েছে আলাদা আলাদা নীতি কথা। বিজেপি গুজরাটে তাদের এই পরিশ্রমলব্ধ জয়কে নিশ্চয় উপভোগ করতে পারে, কেননা দেশের পশ্চিমতম প্রান্তে তারা দুর্গ সুরক্ষিত রাখতে পেরেছে।

অন্যদিকে কংগ্রেসের পরিতৃপ্তি যে তারা পিছিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত কড়া লড়াই করেছে। এটি কেবলমাত্র একটি রাজ্যের নির্বাচন হলেও ভারতের সুপ্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের ওপর মানুষের গভীর আস্থার একটি বড় নিদর্শন। বিভিন্ন কেন্দ্রে কানঘেঁষা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় খুব অল্প ব্যবধানে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি, ফলত বহু জায়গায় বিরোধী পক্ষের আসন লাভ সন্দেহাতীতভাবে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর ইভিএম মেশিন নিয়ে জালিয়াতি বা আনুষঙ্গিক চক্রান্তের ঘৃণ্য অভিযোগকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। এই নির্বাচনে জিএসটি থেকে কোটার রাজনীতি, জাতপাত থেকে হিন্দুত্ব কিছুই পরিসরের বাইরে না থাকলেও শেষমেশ কিন্তু ফলাফল হয়েছে পরিচ্ছন্ন ও সম্পূর্ণ স্বচ্ছ।

গুজরাটবাসী তাদের স্বভাবসিদ্ধ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা অনুযায়ী বিজেপিকে আরও একটি সুযোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়ে দিয়েছে যে দলের তরফে অনেক বিষয়েই আরও জরুরি সংশোধন প্রয়োজন এবং মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনে ঘাটতি থেকে গেছে। অন্যদিকে কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে ভোটদাতারা পরিষ্কার বার্তা দিয়েছে যে বিকল্প শাসকের প্রয়োজন থাকলেও সেক্ষেত্রে সেই দলের সংহত দৃষ্টিকোণ থাকা প্রয়োজন যা জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠতেই শুধু সক্ষম হবে না, একই সঙ্গে কেবলমাত্র শাসকের নিন্দে করেই তার দায় সারবে না এবং রাজ্যভিত্তিক নেতৃত্বের সঙ্গে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি থাকাও আবশ্যিক হতে হবে।

অবশ্যই রাজনৈতিক পরিসরে বিতর্ক চালু থাকবেই বিশেষ করে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন যখন এগিয়ে আসছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই ২০১৭ সালের পরিসমাপ্তি এক ইতিবাচক সঙ্কেত দিয়েই শেষ হলো। ভোটদাতারা উন্নয়নের পেছনেই বাজি ধরেছেন এবং মূলত নির্ণায়ক ফলাফলেরই ব্যবস্থা করেছেন। কোনো ত্রিশঙ্কু অবস্থার সৃষ্টি করেননি। তাই এই ফলাফল যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক হলেও শাসকদলকে জনতার সিদ্ধান্তকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে হবে অর্থাৎ তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার আরও বেশি পূরণ দরকার; অন্যথায় ভবিষ্যতে জনতার আদালতে মুশকিলে পড়তে হবে। ভারতে এই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা সদা বহমান, যদিও এখানকার শাসকমণ্ডলীর মধ্যে শাসন পরিচালনা ক্ষেত্রে নানাবিধ খামতি রয়েছে। তবুও অতি সম্প্রতি বিশ্বের অন্যতম সেরা সমাজ গবেষণা কেন্দ্র 'পিউ রিসার্চ সেন্টার' জানিয়েছে তাদের ফলাফল অনুযায়ী ভারতের ৮০ শতাংশ মানুষ দেশে প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের ওপর সন্তুষ্ট ও আস্থাবান। এর মধ্যে আবার প্রতি ১০ জনের ৯ জন নাগরিক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আস্থাশীল।

> নামি মূল্যায়ন সংস্থা Moody এবং Centre of Economic & Business Research — এই দুই সংস্থার গবেষণাতেই ২০১৮ সালের মধ্যেই ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডকে টপকে ভারতের বিশ্বের পঞ্চম সর্ববৃহৎ অর্থনীতি হয়ে ওঠার আগাম ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এই হিসেব অবশ্যই ডলার মূল্যের সমানুপাতিকভাবেই করা।

অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিশ্বের বহু দেশে সেখানকার সরকার, প্রচার মাধ্যম, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যক্রমের ওপর নাগরিকদের আস্থা শূন্যে গিয়ে ঠেকেছে। অর্থাৎ সেখানকার গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের মর্যাদা রক্ষা করতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে মার্কিন দেশে দলগত বৈষম্য ও একদেশদর্শিতা মাথা চাড়া দেওয়ায় উদার বুদ্ধিজীবীরা সমাজ ব্যবস্থাকে ভঙ্গুর আখ্যা দিয়েছেন। অর্থনৈতিক নিম্নগামিতা থেকে উদ্বাস্তুদের গমনাগমন— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রথম সমগ্র ইউরোপকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। Edelman Trust Barometer-এর ডাভোসে প্রকাশিত বাৎসরিক প্রতিবেদন অনুযায়ী ভারতের চলতি সরকারের ওপর নাগরিকদের বিশ্বাসের স্তর ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের প্রচারমাধ্যমগুলির ওপর আস্থাও বেশি যা দেশের মধ্যে বিরুদ্ধ মত ও তার স্বাধীন প্রচারে কোনো বাধার সম্মুখীন হয় না। ডাভোসে অনুষ্ঠিতব্য ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম-এর আসন্ন সভায় উল্লেখিত রিপোর্টটির সর্বশেষ সংস্করণ প্রধানমন্ত্রী মোদীর উপস্থিতিতে প্রকাশিত হবে।

২০১৭ সালে অর্থনীতি বিমুদ্রীকরণ, জিএসটি থেকে দেউলিয়া বিলের মতো তিন তিনটি বড় ধরনের কাঠামোগত পরিবর্তনের ওলটপালটের ধাক্কা সামলে উঠে নতুন গতি অর্জনের সঙ্কেত দিচ্ছে। জিডিপি-র অধোগতি রুদ্ধ হয়েছে। চাকুরি ক্ষেত্রে সংখ্যা ঊর্ধ্বমুখী। দেশের core sector-এর উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থনীতির বৃদ্ধি শ্লথ হলেও নতুন লাগু হওয়া দেউলিয়া আইনের বলে সমস্ত ঋণ খেলাপি সংস্থার মালিকদের পালাবার পথ বন্ধ হয়েছে। তাদের এবার জবাবদিহির পালা। তাদের ভবিষ্যৎ একেবারেই অনিশ্চিত। এক ধাক্কায় বিশ্বের ব্যবসা করার স্বাচ্ছন্দ্যের নিরিখে ভারত ৩০ ধাপ উঠে ১০০ নং দেশ হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। দেশের কুখ্যাত 'লাল ফিতের' বাঁধনে আটকে থাকা অর্থনীতির চাকা সংস্কারের ফলে অগ্রসরমান হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। জিএসটি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে যেভাবে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ভুলভ্রান্তিগুলির দ্রুত সমাধান করা হয়েছে তার ফলে দেশে করদাতার সংখ্যায় বড়সড় বৃদ্ধি ঘটছে। জিএসটি-র সফল রূপায়ণ ভবিষ্যতে বিশ্বে ভারতের সংখ্যাগত অবস্থানে আরও উন্নতি ঘটাবে সন্দেহ নেই।

নামি মূল্যায়ন সংস্থা Moody এবং Centre of Economic & Business Research---এই দুই সংস্থার গবেষণাতেই ২০১৮ সালের মধ্যেই ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডকে টপকে ভারতের বিশ্বের পঞ্চম সর্ববৃহৎ অর্থনীতি হয়ে ওঠার আগাম ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এই হিসেব অবশ্যই ডলার মূল্যের সমানুপাতিকভাবেই করা। বিমুদ্রীকরণের ফলে বিপুল অঘোষিত টাকা সেভিংস অ্যাকাউন্ট ও মিউচুয়াল ফান্ডগুলির মাধ্যমে অর্থনীতির মূলস্রোতে ঢুকেছে। এরই ফলে অঘোষিত টাকায় বাড়িঘর কিনে রাখার যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল যার পরিণতিতে সম্পত্তিতে অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে মাথার ওপর ছাত কেনা অনেক মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তের হাতের বাইরে চলে যায়। সেই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের ফলে রিয়েল এস্টেটের ক্ষেত্রে মূল্যমান নেমে যায়। হাউসিং কারবারে ঝুঁকিপ্রবণ অনেক অসাধু বিনিয়োগ বন্ধ হয়ে যায়। একই সঙ্গে ডিজিটাল লেনদেনের ১৬-১৭ থেকে ১৭-১৮-য় ৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৮০০ কোটি টাকা ছুঁয়েছে।

বিশ্বের বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলির ইতিবাচক সূচক নির্দেশ করার অর্থ সরকারের নেওয়া কাঠামোগত সংস্কারের ফলে অর্থনীতিতে বৃদ্ধি ঘটিয়ে তা দেশকে বাড়তি উন্নয়নের পথে নিয়ে যাবে। বিজেপি ও শরিকদলগুলি নিয়ে এনডিএ আজ দেশের ১৯টি রাজ্যে ক্ষমতাসীন। এই অবস্থায় তারা জনতার ক্ষোভ, অসন্তুষ্টিগুলির ওপর যথাযথ নজর দিয়ে ২০১৭ সালে অর্থনীতিতে যে ওলটপালট ঘটে গেছে, বিশেষ করে অসংঘটিত ক্ষেত্রে যে আঘাত পড়েছে সেগুলি সামলে নিয়ে মানুষের ইচ্ছা পূরণ করে একটি সমদর্শী শাসনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ রাখতে পারে। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের ধর্মীয় উন্মাদনা বা বাড়াবাড়িকে প্রশ্রয় দেওয়ার কোনো স্থান নেই। ২০১৭ সালের হিসেবে বিশ্ব অর্থনীতির বৃদ্ধির অনুমান ৩.২ শতাংশ যা ২০১১-এর পর সবচেয়ে বেশি। এই পরিস্থিতিতে রপ্তানি বাড়ানোর পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে। মাঝেমধ্যে হোঁচট খেলেও ভারতের বৃদ্ধির রেখাক্রম ঊর্ধ্বমুখী। মানুষের মধ্যে এ যাবৎকাল এক অস্তিত্ব সংক্রান্ত উদ্বেগ বিরাজমান থাকলেও আজ তার পরিবর্তে এক ধরনের আত্মবিশ্বাস পরিলক্ষিত হচ্ছে। নতুন বছর শুরুর সঙ্গে সঙ্গে দেশের আজ এ কথা ভাবার সময় এসেছে যে তারা চিরাচরিত মধ্যপন্থা অবলম্বন করে ধীর গতিতে উন্নয়নের পথে যাবে, নাকি সমৃদ্ধির সোপানগুলির দিকে তীব্রগতিতে ধাবমান হবে।

(লেখক টাইমস অব ইন্ডিয়ার সাংবাদিক এবং কলামিস্ট)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

চিঠিপত্র

আবেগ দিয়ে ইতিহাসের কলঙ্ক মোচন সম্ভব নয়

গত ২৫ ডিসেম্বর স্বস্তিকার চিঠিপত্র বিভাগে মণিকা মুখার্জীর 'ঔরঙ্গজেব পিতৃহন্তারক হতে পারেন না' শীর্ষক পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি কথা :

গত ১৩ নভেম্বরের স্বস্তিকায় ড. প্রসিত রায়চৌধুরীর 'তাজমহল আসলে শিব মন্দির' এবং সন্দীপ চক্রবর্তীর 'তাজমহলের উপেক্ষিত ইতিহাস' প্রতিবেদন দুটির প্রতি লেখিকা উষ্মা প্রকাশ করেছেন এবং আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন 'এ ধরনের লেখায় উদ্বুদ্ধ হয়ে হাজারে হাজারে করসেবকরা হাজির হয়ে দাঙ্গা বাঁধাবে। সেটাই কি লেখকদের মন কি বাত?'

তাঁর এ আশঙ্কা অমূলক। কারণ ভারতে হিন্দুরা দাঙ্গা লাগাতে চায় না, বরং হিন্দুরাই বিধর্মীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে বেশি। উদাহরণ, কাশ্মীর থেকে প্রায় দেড় লক্ষ হিন্দু পণ্ডিতকে উচ্ছেদ হতে হয়েছে মুসলমানদের আক্রমণে। পশ্চিমবাংলার দেগঙ্গা, নলিয়াখালি, ধুলাগড় প্রভৃতি জায়গায় হিন্দুরা আক্রান্ত এবং সর্বস্বান্ত হলেও তারা কিন্তু পাল্টা আক্রমণ করেনি। কাজেই মণিকাদেবীর দুঃশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।

শাহজাহানের বন্দিদশার জন্য ঔরঙ্গজেব দায়ী নয় বলে তিনি যে মত প্রকাশ করেছেন তার স্বপক্ষে কোনো ঐতিহাসিক তথ্য উল্লেখ করেননি। মুঘল সম্রাটদের মধ্যে ঔরঙ্গজেবকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলা হয়। তিনি ছিলেন গোঁড়া মুসলমান— পরম ধার্মিক। ইসলাম ধর্মের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ও প্রশ্নাতীত আনুগত্য নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী তিনি রাজ্যশাসন করেছেন, কখনও বিচ্যুত হননি। কিন্তু হিন্দুদের উপর অত্যাচার, অকথ্য পীড়ন, মন্দির ধ্বংস, বলপূর্বক ধর্মান্তরীকরণ এবং ধর্মান্তরে উৎসাহ দেওয়ার জন্য নবধর্মান্তরিতদের প্রতি অনুকূল্যের সাড়ম্বর প্রদর্শন— তাঁকে একজন ইসলাম অনুপ্রাণিত শাসকরূপেই প্রতিষ্ঠিত করে, নিরপেক্ষ শাসকরূপে নয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, তিনি একজন পরধর্ম বিদ্বেষী, বিভীষিকা স্বরূপ সম্রাট ছিলেন। তাঁর সেই পরধর্ম বিদ্বেষের বহু প্রমাণের মধ্যে স্থানাভাবে মাত্র কয়েকটি তুলে ধরলাম। যেমন—

১। ঔরঙ্গজেব গুজরাটের সুবেদার থাকাকালীন তাঁর কুকীর্তি সম্পর্কে স্যার যদুনাথ সরকার লিখেছেন— The temple of Chintaman, built by Sitadas Jeweller, was converted into a mosque named Quwat–ul–Islam by order of the Prince Aurangzib, in 1645. He slaughted a cow in the temple. যার বাংলা অর্থ দাঁড়ায়— ঔরঙ্গজেব গুজরাটের সুবেদার থাকাকালীন বিখ্যাত চিন্তামন মন্দিরের মধ্যে গোহত্যা করে মন্দিরকে অপবিত্র করেন ১৬৪৫ সালে। পরে মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তরিত করে নাম দেওয়া হয়— কুয়াত-অল-ইসলাম। (Sir Jadunath Sarkar– History of Aurangzib, Vol.-III, P.-174).

২। স্যার জে এন সরকার লিখেছেন— In the 12th year of his reign (9th April, 1669) he issued a general order "to demolish all the schools and temples of the infidels and to put down their religious teachings and practices." অর্থাৎ তাঁর রাজত্বের দ্বাদশ বৎসরে ৯ এপ্রিল, ১৬৬৯ তারিখে ''কাফের হিন্দুদের সকল মন্দির ও শিক্ষায়তন ধ্বংস এবং তাঁদের ধর্মীয় প্রচার, শিক্ষা ও পূজা-অর্চনা বন্ধের জন্য আদেশ জারি করেন।''। (Sir J.N. Sarkar–History of Aurangzib, Vol. III, P.-174).

৩. The temple of Somnath was demolished early in my reign and idol worship (There) putdown. It is not known what the state of things there is at present. If the idolators have again taken to the worship of images at the place, then destroy the temple in such a way that no trace of the building may be left.

অর্থাৎ ''আমার রাজত্বের প্রথম দিকে সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করা হয়। বন্ধ হয় পুতুল পূজা। আমি জানি না সেখানকার বর্তমান অবস্থা কী। যদি মূর্তিপূজক হিন্দুরা পুনরায় পূজা-অর্চনা শুরু করে থাকে তবে মন্দিরটিকে এমনভাবে গুঁড়িয়ে দাও যাতে তার চিহ্ন মাত্র না থাকে।'' এনায়েত উল্লাকে লেখা ঔরঙ্গজেবের পত্র (Sir J.N. Sarkar–History of Aurangzib,Vol.-III, P.-185).

৪. ইংরেজ রাজত্বে ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ— Epigraphia Indo-Moslemica নামে একটি আংশিক তালিকা ১৯০৭-০৮ সালে প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা যায়— (i) destruction of Hindu temples continued throughout the period of Muslim domination. (ভারতে হাজার বছর ব্যাপী মুসলিম রাজত্বে মন্দির ধ্বংস অব্যাহত ছিল। কখনও বন্ধ হয়নি।)

(ii) it covered all parts of India— east, West, North and South. আসমুদ্র হিমাচল এই ধ্বংসলীলা চলেছে।

(iii) All Muslim dynastics, imperial and provincial participated in the "pious performance." (এই মহতী উদ্যোগে দিল্লির শাসক ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ--- সকলেই অংশগ্রহণ করেছে।

ড. প্রসিত রায়চৌধুরী ও সন্দীপ চক্রবর্তী মহাশয় তাঁদের লেখার স্বপক্ষে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ দেওয়া সত্ত্বেও মণিকাদেবী তাঁদের প্রতি উষ্মা প্রকাশ কেন করেছেন তা বোঝা গেল না। মনে হয়, তিনি তাজমহল দেখেছেন, ভারতের ইতিহাস পড়েননি। তিনি তথ্য প্রকাশ না করে শুধু আবেগের কথা লিখে গেছেন। আজ ধীরে ধীরে মুঘল সম্রাটদের কুকীতির কথা প্রকাশ হয়ে পড়ছে

দেখে অনেকেই খুব বিচলিত। মণিকাদেবীও বোধহয় সেই বিচলিত হওয়াদের দলে। কিন্তু সত্যকে চাপা দেওয়া যায় না, আর শুধু আবেগ দিয়ে কোনো কলঙ্ক মোচনও করা যায় না।

—**মণীন্দ্রনাথ সাহা,**
গাজোল, মালদহ।

ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ভণ্ডামি

কিছুদিন আগে গৌরী লঙ্কেশ নামে কর্ণাটকের সাংবাদিক হত্যায় দেশকে আবার অসহিষ্ণুতার চাদরে ঢেকে দেওয়ার এক আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়। বামপন্থী এবং বিরোধীদের দাবি ছিল গৌরী নাকি উগ্র হিন্দুত্ববাদ নিয়ে লিখতেন, তাই বিজেপি এবং আর এস এস-এর টার্গেট ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে গৌরী লঙ্কেশ ছিলেন মাওবাদের বিরোধী। তাঁর ভাই ইন্দ্রজিৎ লঙ্কেশ স্পষ্ট বলেন যে, নকশাল মাওবাদীরা গৌরীকে অনেক দিন যাবৎ প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে আসছিল। অধিকাংশ রাজ্যের মতো কর্ণাটকের আইন শৃঙ্খলার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের হাতে থাকে, কিন্তু লঙ্কেশ হত্যাকাণ্ডে কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে আর এস এস এবং বিজেপিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। অনেক জল গড়ানোর পর কর্ণাটক পুলিশ গৌরীর হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করতে পেরেছে, তার নাম আকবর আলি।

প্রকৃতপক্ষে বাম শাসিত রাজ্যে আর এস এস এবং বিজেপি কর্মীদের নিধন চলছে। কেরালায় আন্দালুড়ে ২০১৭-১৮ জানুয়ারিতে ৫২ বছর বয়সী বিজেপি কর্মী এজুতান সন্তোষকে হত্যা করা হয়। ২০১৭-র ১২ মে পায়ানুরে স্বয়ংসেবক বিজু দাসকে কমিউনিস্টরা হত্যা করে। ২৯ জুলাই আরেক স্বয়ংসেবক রাজেসকে হত্যা করা হয়। ২০১৬-র ১৩ ফেব্রুয়ারি স্বয়ংসেবক সুজিতকে হত্যা করা হয়। ২০১৬-র ৪ সেপ্টেম্বর কান্নড়ে ২৬ বছর বয়সী বিনেশকে হত্যা করা হয়। অক্টোবরে বিজেপি কর্মী রামিতকে নির্মমভাবে খুন করা হয়। উল্লেখ্য যে ২০১২-তে তাঁর পিতা উত্তমকেও একই কায়দায় হত্যা করা হয়েছিল।

এভাবেই বাম শাসিত রাজ্যে চলছে লাল সন্ত্রাস, বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করার আপ্রাণ ধারাবাহিক প্রয়াস। অথচ এই লাল শিবির ভারতে অসহিষ্ণুতার নামে গেল গেল রব করে চলেছে। গৌরী লঙ্কেশের আগেও অনেক সাংবাদিককে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হত্যা করা হয়, কিন্তু তখন ওই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা আওয়াজ তোলেননি।

সমাজের তথাকথিত কিছু মুখোশধারী বুদ্ধিজীবী এবং সংবাদমাধ্যম হঠাৎ কোনো একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা ভারতবর্ষকে অসহিষ্ণুতার চিত্রে অঙ্কিত করেন, যেমনটি হয়েছিল আখলাক কাণ্ডে। কিন্তু ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার শিকার আখলাক প্রথম ও শেষ ছিলেন না। ভারত ভূখণ্ডে কাশ্মীরি পণ্ডিতরা সবচেয়ে বেশি অসহিষ্ণুতার শিকার। কোনো মানবাধিকার সংস্থাকে দেখা যায় না আওয়াজ তুলতে, কিংবা তাঁদের পাশে দাঁড়াতে। ২৫ বছর আগের বাবরি ধাঁচা ধ্বংসের নিন্দায় মুখোশধারী ধর্মনিরপেক্ষরা রাজপথ কাঁপিয়ে তোলে। কিন্তু তারা একটি বারের জন্যও স্মরণ করে না বাবরি ধাঁচা ধ্বংসের পর অজস্র মন্দির জেহাদিরা দেশে বিদেশে গুড়িয়ে দিয়েছিল। অসহিষ্ণুতার যদি প্রসঙ্গ আসে তাহলে বাম শাসিত রাজ্য সবার ঊর্ধ্বে। পশ্চিমবঙ্গে লাল হিংসায় সবচেয়ে বেশি হত্যা কেন্দ্রীভূত হয়েছে। কেরল এবং ত্রিপুরায় একই ধাঁচে আর এস এস, বিজেপি এবং সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা বাম অসহিষ্ণুতার শিকার হচ্ছেন। গত ২৯ নভেম্বর ত্রিপুরায় গভীর রাতে বিজেপি কর্মী হরি মলসমকে গুলি করে হত্যা করা হয়। বাম শাসিত এই রাজ্যে সাংবাদিকরা আতঙ্কিত— দু-মাস অন্তর পরপর দু'জন সাংবাদিক নিহত হওয়ায়। ত্রিপুরায় খয়েরপুর ২ নং ব্যাটেলিয়ানের আর কে নগরে খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে সাংবাদিক সুদীপ দত্ত ভৌমিককে প্রাণ দিতে হয়। গত ২০ সেপ্টেম্বরে শান্তনু ভৌমিক নামে স্থানীয় এক নিউজ চ্যানেলের সাংবাদিককে হত্যা করা হয় একটি লাইভ সংগ্রহের সময়। বামপন্থীদের ট্রাইব্যুনাল সংগঠনকে Indigenous People's Front Of Tripura (IPFT) ঘটনার জন্য দায়ী করা হয়েছে। বামপন্থীদের অসহিষ্ণুতার প্রতিবাদে কেরলে বিজেপি এবং এবিভিপির যৌথ উদ্যোগে 'কেরল চলো' অভিযান অনুষ্ঠিত হয়। বামপন্থীরা সর্বদা নাস্তিকতায় বিশ্বাসী, কিন্তু কেরলে তাদের সখ্য কট্টর খ্রিস্টান ও কখনো বা মুসলিম লিগের সঙ্গে। বামপন্থীরা কেন শুধু হিন্দু ধর্মকেই আফিম এবং এলার্জি বলে, যার উত্তর আজও তারা দিতে পারেনি। 'কেরল চলো' অভিযানের পরদিনই হত্যা করা হয় সঙ্ঘকর্মী ২৬ বছর বয়সী স্বয়ংসেবক আনন্দকে।

দেশের যে কোনো ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা বা অস্থিরতায় মুসলিম ব্রিগেড, বামপন্থী, কংগ্রেস-সহ অন্যান্যরা অভিযোগের তর্জনী আর এস এস-এর দিকে তোলেন। তথাকথিত এই বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে সঙ্গে বিকৃত মানসিকতার কিছু মিডিয়াও হইচই শুরু করে দেয়। গৌরী লঙ্কেশকে যদি কর্ণাটকে হত্যা করা হয় তার জন্য রাজ্য সরকার দায়ী, আর এস এস-কে এর জন্য কেন টানা হয়? অথচ বাম সরকার শাসিত ত্রিপুরায় সাংবাদিক শান্তনু ভৌমিক এবং সুদীপ দত্ত ভৌমিকের হত্যার দায় কে নেবে? আজ সুশীল সমাজ কোথায় যারা আগের ঘটনাগুলিতে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলেছিল? আসলে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে এসব নিছক এক ভণ্ডামি।

—**রঞ্জন কুমার দে,**
কাছার, অসম।

পরম্পরা

সূর্যদেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উৎসব

মকর সংক্রান্তি

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

বাংলা বর্ষপঞ্জীর নবম মাস পৌষ। এই সংক্রান্তিতে সূর্য ধনু রাশি থেকে মকরে সঞ্চারিত হয়, তাই এর নাম 'মকর সংক্রান্তি'। একে 'উত্তরায়ণ সংক্রান্তি'ও বলে। কারণ এই দিন থেকে সূর্য উত্তরায়ণের দিকে যাত্রা শুরু করে। এই সংক্রান্তিতে ব্রাহ্মমুহূর্তে যমুনা নদীতে মকর-স্নান করলে আয়ুবৃদ্ধি হবে— এই বিশ্বাসে মাতা যশোমতী বালক কৃষ্ণকে স্নান করাতে নিয়ে যান। পরে এদিনেই যমুনায় স্নান সেরে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধিকার সঙ্গে 'মকর-পাতায়', এ হলো আত্মার সঙ্গে আত্মার দৃঢ় বন্ধন স্থাপন। বাংলার অনেক স্থানে একসময় কুমারী মেয়েরা এইদিন থেকে কনকনে ঠাণ্ডার ভোরে একমাস ব্যাপী মকরস্নান- ব্রত শুরু করতো। আলস্য, নিদ্রা, তন্দ্রা, জড়তা-তামসিকতার রিপুগুলিকে জয় করার এ হলো সংগ্রামী মনোবৃত্তি। ছড়া গেয়ে পাঁচ ডুব দেওয়ার নিয়ম ছিল : ''এক ডুবিতে আই-ঢাই।/দুই ডুবিতে তারা পাই।।/তিন ডুবিতে মকরের স্নান।/চার ডুবিতে সূর্যের স্নান। পাঁচ ডুবিতে গঙ্গাস্নান।।''

উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে বাস্তুপূজার প্রচলন আছে। শঙ্খপাল, বঙ্কপাল, ক্ষেত্রপাল, নাগপালের ধ্যান করে বাস্তুর ধ্যান ও মানসোপচারে পূজা করা হয় এইদিন। বাস্তুর প্রণাম মন্ত্র হলো, ''ওঁ বাস্তুরাজ নমস্তুভ্যং পরমস্থানদায়ক। সর্বভূতজিতস্ত্বঞ্চ বাস্তুরাজ নমোঽস্তুতে।'' এরপর পাদ্যাদি দিয়ে গ্রাম্যদেবতার পূজা করা হয় এবং পায়স-বলি দান করা হয়।

'আমার মা'র বাপের বাড়ি' গ্রন্থে রানী চন্দ লিখছেন, পৌষ সংক্রান্তি ''মহাধুমধামের সংক্রান্তি। বসতভিটার মঙ্গলের জন্য বাস্তুপূজা হয় এদিন। তুলসীমণ্ডপে 'ঝিকা' গাছের ডাল কেটে তার তলায় পুজো হয়। পুরুতমশাই নিজে 'চরু' রান্না করে দিয়ে যান। আজ এই চরু-ই পূজার প্রধান অঙ্গ।'' চরু রান্না হয় পাটশলমির আগুনে, নতুন মাটির হাঁড়িতে দুধ-চাল-বাতাসা ফুটিয়ে।

পৌষ সংক্রান্তির দিনে গ্রাম-বাংলার অনেক স্থানে উঠোনে মড়াইয়ের পাশে 'উঠোন লক্ষ্মী'র পুজো হয়। তিনিই কোথাও 'পৌষলক্ষ্মী'। এদিন বাড়ির উঠোন গোবরজল দিয়ে নিকিয়ে, শুচি-স্নিগ্ধ করে তোলা হয়। ধানকাটা পর্বে যে 'পৌষ তোলা'র চার-পাঁচ গুচ্ছ ধানগাছ সাদরে গৃহস্থ বাড়িতে আনা হয়েছিল, তাই গাদা থেকে নামিয়ে মাথায় বহন করে নামানো হয় উঠোনে। গোটা উঠোন জুড়েই আলপনার নান্দনিকতা। আঁকা হয় লক্ষ্মীর নানান গয়না; চাষের সমস্ত উপকরণ— গোরু, লাঙল, জোয়াল, মই; আর লক্ষ্মীর পা—পৌষ গাদা থেকে পুজোস্থল পর্যন্ত, পুজোস্থল থেকে গৃহের সিংহাসন পর্যন্ত। এই চরণচিহ্নে পা ফেলেই যেন লক্ষ্মী ঘরে আসবেন। বাংলার কোনো কোনো স্থানে একে বার (বাহির) লক্ষ্মীপুজোও বলে। পুজো শেষ হলেই ঠাকুর তোলা যায় না। রাতে লক্ষ্মীপেঁচা বা শেয়ালের (দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলে শেয়াল লক্ষ্মীর বাহন বলে কথিত) ডাক শুনে উঠোন থেকে লক্ষ্মীকে ঘরে তোলা হয়। গভীর রাতে লক্ষ্মী তুলে উঠোন নিকিয়ে ঘুমোতে যান গৃহকর্ত্রী।

পৌষ সংক্রান্তির সঙ্গে সম্পর্কিত একটি লোকাচার হলো 'আওনি- বাউনি' বা 'আউরি-বাউরি'। এটি আগের দিন পালিত হয়। তবে দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলে এর নাম 'চাঁউনি-বাঁউনি' বা 'চাউড়ি-বাউরি' যা পৌষপার্বণের দু'দিন আগে 'মচ্ছিমুলো' খেয়ে পালিত হয়। 'গণদেবতা' উপন্যাসে এর বর্ণনা এইরকম, ''...আউরি-বাউরি দিয়া সব রাঁধিতে হইবে, মুঠ লক্ষ্মীর ধানের খড়ের দড়িতে সমস্ত সামগ্রীতে বন্ধন দিতে হইবে, — আজিকার ধন থাক, কালিকার ধন আসুক, পুরানো নূতনে সঞ্চয় বাড়ুক। লক্ষ্মীর প্রসাদে পুরাতন অন্নে নূতন বস্ত্রে জীবন কাটিয়া যাক নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায়। অচলা হইয়া থাক্ মা, অচলা হইয়া থাক্।'' সোনার পৌষ যে চলে যায়, তাকে বাঁধতে হবে! তাই শিস-সহ ধানগাছ পুজো করে ঘরের খুঁটি, গোলা, গোয়াল ঘর, সিন্দুক ঢেঁকিশালে বাঁধা হয়। আর শস্য-সম্পদের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করা হয়। তারই অঙ্গ হিসাবে বাংলার মেয়েরা ছড়া কেটে পৌষ বন্দনা করেন, ''পৌষ পৌষ— সোনার পৌষ/এস পৌষ যেয়ো না/জন্ম জন্ম ছেড়ো না।/না যেয়ো ছাড়িয়ে পৌষ—/না যেয়ো ছাড়িয়ে,/পৌষ পৌষ—সোনার পৌষ।''

পৌষ সংক্রান্তির আগের রাতে রাঢ় তথা পশ্চিম সীমান্ত বাংলায় 'টুসু জাগরণ' হয়। টুসু উৎসবের শুরু অঘ্রাণ সংক্রান্তিতে। পৌষ সংক্রান্তির ভোরে সূর্যোদয়ের আগে টুসু বিসর্জন দেওয়া হয়। কারণ সূর্যের সঙ্গে টুসুর

ভাসুর-বুয়াসি বা ভাদ্র-বউ সম্পর্ক। যেহেতু চৌডল ব্যবহার করলে সূর্যদেব দর্শিত হন না, তাই সুদৃশ্য চৌডলে টুসু ভাসান যায়।

তুষ-তুষলীর ব্রতিনীরা এই দিন মাস-কালীন ব্রতের শেষে জমিয়ে রাখা তুষ-গোবরের গুলি মাটির হাঁড়িতে রেখে আগুন ধরায়। তারপর তা ভাসিয়ে দেয় নদী বা পুকুরের জলে। একাধিক ব্রতিনীর ভাসানো অগ্নিশিখা বহনকারী হাঁড়ি বায়ুচালিত হয়ে ঘাট-ঘাটলার কিনারে কিনারে চরে বেড়ায়।

বাংলার কোনো কোনো স্থানে এদিন 'ধর্মের পিঠে' উদ্‌যাপিত হয়। এই লোকানুষ্ঠানটি ধর্ম বা সূর্য পূজার অঙ্গ। বাড়ির উঠোন সকালে গোবর জলে নিকিয়ে নতুন কলকে নিয়ে পিটুলির ৫টি গোলাকার ছাপ দেওয়া হয়। ছাপ পড়ে গোয়ালে, গবাদিপশুর দেহে, গোলায়, ঢেঁকিশালে এবং ঘরের মধ্যে। গৃহস্থের সামগ্রিক কল্যাণ কামনাই এই লোকানুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য।

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলায় এদিন বৎসরান্তের কৃষিকাজ সমাপনান্তে খামার খুঁটিকে কেন্দ্র করে উৎসবের আয়োজন হয়। একে 'মেহি পূজা' বলে। কারণ 'মেহি'-র অর্থ খুঁটি। এই খুঁটি ঝাড়াই-মাড়াই সহ নানান কাজের সাক্ষী, গোরু বাঁধার স্থান। তাই মেহি পূজা বা খামার পূজা হলো এক কৃতজ্ঞতার অনুষ্ঠান, ধন্যবাদাত্মক চিন্তন। খুঁটিকে কেন্দ্র করে আঁকা হয় নানান কৃষি উপকরণে আলপনা, পরিষ্কার করে সাজানো হয় সেইসব উপকরণ। কৃষক-পুরুষ শেয়ালের ডাক শুনে পুজোয় বসেন। পুজো শেষে নতুন ধানে ভরা মান মরাইতে তুলে সে বছরের মতো কৃষিকার্যের সমাপ্তি হয়।

পৌষ সংক্রান্তিতে গ্রহণ করা হয় দধি সংক্রান্তির ব্রত। এ দিন সেই ব্রতের সূচনা, প্রতি সংক্রান্তিতে তার আচরণ এবং পরের বছর এই দিনেই ব্রতের প্রতিষ্ঠা বা সমাপ্তি। এই দিন দধি দ্বারা বিষ্ণু ও লক্ষ্মীকে স্নান করিয়ে দধি ও ভোজ্য ব্রাহ্মণকে দান করা হয়। শোনা হয় ব্রতকথা। ফল-সংক্রান্তি ব্রতের অঙ্গ হিসেবে এই সংক্রান্তিতে হরিতকী দান করলে হংসযুক্ত রথে আরোহণ করে বৈকুণ্ঠে গমন করা যায় বলে হিন্দুদের বিশ্বাস।

পৌষপার্বণ পিঠেপুলির অনুষ্ঠান। এজন্য চাল কোটা হয় 'বাউরি'-র আগের দিন। চাল গুঁড়ো, ভেজা চাল সর্বদা উঠোন-ঘর করতে হলে তা পাত্রে ঢেকে, তুলসীপাতা আর শুকনো লঙ্কা দিয়ে নিয়ে যেতে হয়, নইলে তা ভূতে পায়।

ঠাকুরমা'র ঝুলির 'কাঁকনমালা, কাঞ্চনমালা' গল্পে রয়েছে 'পিট-কুড়ুলির ব্রত'-র কথা, রাজ্যে পিঠা বিলানোর অনুষ্ঠান। রানিকে চালের গুড়োয় আঙ্গিনায় আলপনা দিয়ে পিঁড়ি সাজিয়ে দিতে হয়, দাসীরা পিঠের জোগাড়-জাগাড় করে। রানি রূপী দাসী তৈরি করেন আস্কে পিঠা, চাস্কে পিঠা আর ঘাস্কে পিঠা; দাসী বানান চন্দ্রপুলি, মোহনবাঁশী, ক্ষীরমুরলী, চন্দনপাতা। দাসী চালের গুঁড়োয় খানিকটা জল মিশিয়ে এতটুকু নেকড়া ভিজিয়ে পদ্ম আঁকলেন, পদ্ম-লতার পাশে সোনার সাত কলস আঁকলেন; কলসের উপর চূড়া, দুই দিকে ধানের ছড়া, ময়ূর, পুতুল, মা লক্ষ্মীর সোনা পায়ের দাগ। সংক্রান্তির পূর্বদিন অনেক স্থানে ভাজা পিঠে হয়; তা সেদিন ও পরদিন সকালে খাওয়া হয়। সংক্রান্তির দিন তৈরি হয় নানান পিঠে, সেগুলি সেদিন ও পরদিন খাওয়া হয়। পৌষ পার্বণের পরদিনও পিঠে তৈরি হয় যা তার পর দিন পর্যন্ত খাওয়া হয়। এইভাবে গ্রাম বাংলায় পরপর চারদিন পিঠে উৎসব ও ভোজন।

পৌষ সংক্রান্তিকে 'তিল সংক্রান্তি'ও বলে। এদিন তিল দিয়ে নাড়ু, মিষ্টি তৈরি করে পূজায় নিবেদিত হয়। লোকবিশ্বাস, এই দিন তিল না খেলে নাকি দিন বাড়ে না অর্থাৎ সূর্যের মকর যাত্রা সংঘটিত হয় না।

মেদিনীপুরে এইদিন লৌকিকদেবী বড়াম; মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলীতে সিনিদেবী এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বারা ঠাকুরের যুগ্মমূর্তি, নারায়ণী ও দক্ষিণ রায়ের বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মেদিনীপুর, পিংলা, ময়না, সবং অঞ্চলের মাহিষ্য কৃষক সম্প্রদায় এদিন বিকেলে 'বণিপুজো'র আয়োজন করে। গৃহের পুরুষ বা নারীরাই এর উদ্যোক্তা এবং পূজক। এর তিনটি পর্যায়— মই খুঁটি প্রতিষ্ঠা, খেত মাড়ান এবং 'সাঁথ ধরা'। এটি মেহি পূজার মতোই এক লোকাচার। খেত মাড়ান পর্বে চাষের জমিতে রক্ষিত একগুচ্ছ ধান গাছের ('ঝুঁটি') গোড়ায় 'লবাৎ' (নতুন ধানের চাল বেটে প্রস্তুত মিষ্টান্ন) ও ফলমূল নৈবেদ্য রেখে সরষে ও সাদা কল্কে ফুল ('শুক্র যাদু'-র প্রতীক) দিয়ে পুজো করতে হয়। এরপর সেই ঝুঁটি ছিঁড়ে তা মইখুঁটির সঙ্গে বাঁধা হয়। আগামী বছর ভালো ধান হবার এ এক লৌকিক প্রার্থনা। 'সাঁথ ধরা' হলো বন্য প্রাণীর ডাক শুনে সেই পূজিত 'ঝুঁটি' সযত্নে ধানের গোলায় তুলে রাখার অনুষ্ঠান। লোকবিশ্বাস, শেয়ালের সাঁথ ধরা সবচাইতে সৌভাগ্যের বিষয়।

রাঢ় অঞ্চলের অনেক স্থানে পৌষ সংক্রান্তির পরদিন তপশিলি সম্প্রদায়ের মানুষ কর্তৃক 'আক্ষেন' বা 'আখ্যান দিন' পালিত হয়। একে 'এখ্যান যাত্রা'-ও বলে। এদিন লোকদেবতা ও অপদেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হয়। পূজার শেষে আয়োজিত হয় নৃত্য-গীতের অনুষ্ঠান।

অনেক স্থানে এইদিন গ্রামের বালকেরা 'কুলাইর মাগন' বা 'কুলের মাগন' বা 'পৌষ মাগন' পালন করে। তারা আমন ধান উঠে যাবার পর বাড়ি বাড়ি গিয়ে যে চাল, ডাল, সবজি মাগন করে আসে তা এইদিন নিজেরাই মাঠে রান্না করে কুলাই ঠাকুরকে নিবেদন করে এবং একত্রে ভোজন করে।

একটি প্রচলিত কথা হলো, 'অন্নচিন্তা চমৎকারা'। কৃষকের গোলায় যখন ক্ষুধান্নের মজুত পরিপুষ্টি লাভ করে তখনই আসে শান্তি ও সমৃদ্ধির উৎসব। ফসলোত্তর এই সংক্রান্তি সেই শান্তির বার্তাই নিয়ে আসে সমগ্র বৃহত্তর ভারতবর্ষে। পশ্চিম ভারতে এটি 'মকর সংক্রান্তি', দক্ষিণের রাজ্যে 'পোঙ্গল', উত্তর ভারতে 'লোহরি', অসমে 'ভোগালি বিহু'; সুনির্দিষ্ট ভাবে কর্ণাটকে 'ইল্লুবিল্লা' এবং 'মকর সংক্রমণা', উত্তর প্রদেশে 'খিচড়ি', গুজরাটে 'উত্তরায়ণ', হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশে 'মাঘী', মহারাষ্ট্রে 'তিলগুল', বিহার-ঝাড়খণ্ডে 'সকরাত'।

সর্বত্রই ফসল তোলা, ঝাড়াই, মাড়াইয়ের অবসরে নদী বা সাগরে পুণ্যস্নান; ঐতিহ্যবাহী খাদ্যসামগ্রী রচনা ও বিতরণ; নববস্ত্র পরিধান আর সূর্যদেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উৎসব।

প্রয়াগ, হরিদ্বার, গড় মুক্তেশ্বর, গঙ্গাসাগর প্রভৃতি স্থানে এই উপলক্ষে জমকালো মেলা বসে। প্রয়াগে কুম্ভ মেলার সূচনা আর শবরীমালায় তীর্থযাত্রার সমাপ্তি। লোকবিশ্বাস, এদিন পরলোকগমন করলে তাকে আর ইহজীবনে ফিরে আসতে হয় না, সরাসরি বৈকুণ্ঠ লাভ হয়। নানান রাজ্যে 'তিল-গুড়' বা 'তিল-লাড্ডু' এদিনের শীতলতায় এক শক্তিদায়ী উষ্ণ খাবার। দক্ষিণের রাজ্যে তৈরি হয় 'পোঙ্গল'। তামিল বা তেলুগু ভাষায় শব্দটির অর্থ হলো 'হাঁড়িতে ভাত সেদ্ধ করা'। নতুন চাল, ভাজা মুগ, বাদামি আখের গুড়, ইক্ষু-শক্কর, দুধ ও নারকেল দুধের সঙ্গে কিশমিশ-কাজু-এলাচে প্রস্তুত এক সুস্বাদু মিষ্টান্ন।

গুজরাটে এদিন পালিত হয় ঘুড়ি উৎসব। এর প্রতীকী তাৎপর্য অসীম। আপন আকুতি দেবতার কাছে নিবেদনের নান্দনিকতায় রং-বেরংয়ের ঘুড়ির রূপ ধারণ করে তারা আকাশে ওড়ে। তেলুগু গৃহস্থেরা এদিন গৃহের পুরাতন সামগ্রী বিক্রি করে বা আগুন ধরিয়ে বন-ফায়ার' করে। পঞ্জাবিদের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত আছে। অন্ধ্র প্রদেশ-তেলেঙ্গানায় গবাদিপশুকে এদিন নানান সামগ্রী ভোজন করানো হয়। গুজরাটে তাদের পায়ে আঁকা হয় নানান রং। এই দিনে জ্ঞান ও বিদ্যার দেবী সরস্বতীকে স্মরণ-মনন করে মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি দেন গুজরাটি পণ্ডিতেরা। অধ্যাত্মিক মনন ও অভ্যাসে এই দিনটি তাই মান্যতা পেয়ে এক সর্ব ভারতীয় উৎসবের মর্যাদা লাভ করেছে; পাপ, অপরিচ্ছন্নতা ও অপবিত্রতা দূরীকরণই যার মূল সুর।

তথ্যপঞ্জী :

১. স্বামী নির্মলানন্দ (১৪১০) বারো মাসে তেরো পার্বণ (৬ষ্ঠ সংস্করণ), ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, কলকাতা।

২. চিন্তাহরণ চক্রবর্তী (২০১৪) হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠন (তৃতীয় মুদ্রণ), প্যাপিরাস, কলকাতা।

৩. বরুণ কুমার চক্রবর্তী (১৯৯৫) বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতিকোষ (সম্পাদনা), অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা।

৪. সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৮৪) বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান, ক্যালকাটা পাবলিকেশনস্, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৫৮-১১৭।

৫. সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (১৩৯৩) পুরোহিত-দর্পণ (অষ্টত্রিংশ সংস্করণ), সত্যনারায়ণ লাইব্রেরি, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪০১-৪২০।

৬. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় ও কল্যাণ চক্রবর্তী (২০০৯) কৃষক পরিবার, দক্ষিণের বারান্দা ১ (২) : ১৪-১৬।

জাপানের দেবী সরস্বতী

দেবী বেনজৈতেন

সৌমেন নিয়োগী

বৈদিক জ্যোতিরূপা দেবী সরস্বতী ও নদী সরস্বতী সম্মিলিত ভাবে জ্ঞান, নিষ্কলুষ, স্বচ্ছতা, বিদ্যা ও ললিতকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে পুরাণ, তন্ত্র ও সাহিত্যেই হিন্দু সংস্কৃতির শ্রদ্ধা ও ভক্তির অধিকারিণী হয়ে পূজিত হয়েছেন না, বরং দেবীর আরাধনার বিস্তৃতি ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করে দেশ দেশান্তরে প্রসারিত। এই ভাবেই তিব্বত, চীন হয়ে দেবীর আরাধনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জাপানে। একবিংশ শতকে জাপানের বিভিন্ন প্রদেশে দেবী সরস্বতী শুধু যে কেবল জ্ঞান, বিদ্যা বা কৃষ্টির দেবীরূপে পূজিত হচ্ছেন তা নয়, বরং জাপানের টোকিয়ো, কামাকুরা, কিয়োটো ইত্যাদি স্থানে ঐশ্বর্য বা ধনপ্রাপ্তির দেবীরূপেও সমান ভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজিত হচ্ছেন। পণ্ডিত অমূল্যচরণ তাঁর সরস্বতী গ্রন্থে বলেছেন যে 'যবদ্বীপে প্রাপ্ত পদ্মাসীনা সপ্ত সরস্বতী বীণাহস্তা বীণাবাদিনী সরস্বতী মূর্তি; তিব্বতে ব্রজধারিণী ময়ূর বাহনা ব্রজসরস্বতী ও বীণাপাণি সরস্বতী; জাপানে বেনতেন নামধারিণী সর্বাসনাদ্বিজা বীণাপানি, অষ্টভূজা হপ্পিবেনতন সরস্বতীর বহির্ভারতে পাড়ি দেওয়ার অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করে।' জাপানে বেনতেন বা বেনজৈতেন আকৃতি সুন্দর, ভক্তদের তিনি জ্ঞান, বাক্স্মিতা, সঙ্গীত, সম্পদ, রণজয় এবং নদীর জলপ্রবাহ প্রদান করেন। সমগ্র জাপানে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় দেবী সকল ভক্তের প্রার্থনা পূর্ণ করেন, তাঁর বিউয়া নামক বাদ্যযন্ত্র বীণা অত্যন্ত প্রিয়। 'জাপানে বেনতেন দ্বিবিধরূপে পূজিত হন। এক রূপে তিনি বীণাবাদনতার সুন্দরী, অপররূপে তিনি ভয়ঙ্করী যোদ্ধাবেশ ধারিণী অসি হস্তা, পদতলে কচ্ছপ ও সর্প।' জাপানে দ্বিভুজা বেনতেনের মন্দিরগুলি হলো এনোশিমো জিনজা, কামাকুরা, রকুহারা মিতশুজি, কিয়োটো, তাকাহাটা ফুডো মন্দির টোকিও।

অষ্টভুজা হাপ্পিবেনতেন রূপে এনেসিমজিজও গোকুজি, টোকিও, কোনজি, সাইজো মন্দিরে পূজিত হন রণজয় কামনার্থে। এখানে দেবীর হাতে থাকে ধনু, তরবারি, কুঠার, পাশ, বাণ, বর্শা, দীর্ঘ দণ্ড ও লোহচক্র। ওসাকায় বেনতেনের আধুনিক মন্দির বেনতেনশু এখন পৃথিবীর সর্বোচ্চ সরস্বতী মন্দির। দেবী যেমন বীণাপাণী রূপে পূজিত হবার জন্য এনোসিমজিজও মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে রয়েচে বিউয়া বা বীণা, তেমনি নদী রূপেও পূজিত হন। বৃহতবীণা সদৃশ্য এক জলাধার লেক বিউয়া বা কিয়োটোতে অবস্থিত।

মানব সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে ভারতবর্ষে যে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্ম হয়েছে তা বহির্ভারতে উদিত সূর্যের দেশ জাপানে আজও সযত্নে লালিত ও পালিত। যেখানে প্রযুক্তি ও উৎকর্ষতার ঘটেছে মেলবন্ধন। ■

মেয়েদের প্রতি অন্যায়ের প্রতিবাদ মেয়েদেরই করতে হবে

পূজা দাস

শাশুড়ি, ননদের অপরিসীম অত্যাচারের পর দিনান্তে স্বামীর কাছে একটু ভালবাসা পাওয়াটা তার কাছে অপরাধ হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের পরের বছরই প্রথম সন্তান হবার পর দ্বিতীয় বার স্বামী রুদ্রনারায়ণ কোনও এক বিধবা মহিলার সঙ্গে প্রণয়ে আকৃষ্ট হয়— অতি আশ্চর্য! কিন্তু তাও, ঝুমা মুখ বুজে সহ্য করে যায় সন্তানের মুখ চেয়ে। দিন চলতে থাকলে মেয়েকেও মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে আনা হয়। আঘাত পড়ে তার মাতৃত্বেও। তৃতীয়বার স্বামী রুদ্রনারায়ণ অন্য কোনও বিবাহিত প্রেয়সীকে ভালবাসার ফাঁদে ফেলে বিয়ে করে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত রুদ্র ঘরে ফেরে না। ঝুমা সহ্য করতে থাকে এই অন্যায়। মারধোর, লাঠি পেটা, অপমান সহ্য করে। এসব নতুন করে ঝুমার মনে আর দাগ কাটে না। নিঃসঙ্গ জীবন ভালই লাগে। তা সত্ত্বেও শিক্ষিত সমাজ নিরুদ্বিগ্নে বলতে পারে— 'নারী নির্যাতন আমরা মুছে দিয়েছি'— তখন কোথায় ছিলেন তাঁরা যখন ঝুমা একুশ বছর বয়সে গায়ে আগুন দিয়েছিল?

নারী নির্যাতন আজ আর নতুন কিছু নয়। প্রতিটি সংবাদপত্রের কোনও না কোনও পৃষ্ঠায় প্রতিদিন জায়গা করে নেয় ধর্ষণ, বধূহত্যা, কন্যা-সন্তান হত্যা নিয়ম করে। দোষটা আসলে আমার, আপনার, জনতার কারোরই নয়। আমরা মেয়েরাই যেতে পারিনি সেই আইন নামক ছাতার তলায়— আজও ভয় পাই প্রতিবাদী আওয়াজ তুলতে অপরাধীদের বিরুদ্ধে।

বিগত বছরগুলিতে নর্থ-ইস্টের মধ্যে ত্রিপুরা নারী সংক্রান্ত অপরাধে শীর্ষ স্থান দখল করেছে। তা নিতান্তই লজ্জার। তবে মাথা নীচু করে ভদ্র সমাজে ভদ্র হয়ে বসে থাকাটা যদি ভদ্রতা হয়— তবে অভদ্রের মতো আঙুল দিয়ে অন্যায়কে ধরিয়ে দেওয়ার অভদ্রতাকে আমি শ্রেয় মনে করি। প্রশ্রয়টা আসলে মেয়েরাই দিয়েছি—সেটাতো নতুন কিছু নয় যে হঠাৎ করে শুরু হয়েছে। আসলে এই অবর্ণনীয় নারকীয়তা সহ্য করাটা আমাদের রক্তে মিশে গেছে। ত্রিপুরার প্রায় অলিতে গলিতে প্রতি আট ঘণ্টায় একজন মহিলা নির্যাতনের শিকার। নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে পুরুষের এরকম নৃশংসতার শিকার নারীরা এ কারণে হই যে আমরা প্রতিবাদের আওয়াজ তোলার মতো সাহস আর জোগাতে পারি না। শারীরিক, মানসিক নির্যাতন স্বীকার করে নিজের সম্মানকে হৃদয়ের আড়ালে পুঁতে রেখে নিজের মস্তিষ্ক, মনন, চিন্তশীলতাকে বিসর্জন দিয়ে চুপ করে বসে থাকাটাকে আমরা নারীর অলঙ্কার, মনুষত্ব বলে মনে করি। নির্বাক, পথের দর্শক হয়ে এই নোংরামির প্রত্যক্ষ সাক্ষী না হয়ে একটু প্রতিবাদ তো করতেই পারি।

আজকাল কান পাতলেই শোনা যায়, অনেকেই বলেন— 'এ বড়ো কঠিন সময়'। আমাদের মনোজগৎ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের উপরে আঘাত। আজ একবিংশ শতকে বিজ্ঞান প্রযুক্তির এই সভ্য যুগে দাঁড়িয়ে আমরা যখন আধুনিকতার বড়াই করি, তখন বহু নারী অপমানিত- লাঞ্ছিত-নির্যাতিত হচ্ছে ঘরে-বাইরে। একটি কন্যাভ্রূণ যদি হত্যা হয়, একজন নারীও যদি ধর্ষিতা হয়, একটি বধূ যদি পণপ্রথার বলি হয়, সেই জন্য কি লজ্জিত হবে না আধুনিক ও উন্নাসিক সমাজ? লজ্জিত তাকে হতেই হবে। নতুবা কোন্ বালিতে মুখ লুকিয়ে পরিত্রাণ খুঁজবে। অন্ধ হলে কী হবে, প্রলয় যে অনিবার্য। এই প্রলয় আর পরিবর্তনের জন্য। সচেতন মননের অধিকারী ধরে কাউকে না কাউকে তো এগিয়ে আসতেই হবে।

আজকের সমাজের যথাযথ উন্নতি, প্রগতি ও অগ্রগতি সবই সম্ভব যদি নারী-পুরুষের মিলিত বৈষম্যহীন সমাজ তৈরি করা যায়। প্রতিক্ষেত্রেই বৈষম্য ডেকে আনে হিংসা ও হিংসাত্মক আক্রমণ, যার শিকার নারীরাই। বিদ্রোহী কবির ভাষায় 'সেদিন সুদূর নয়— যেদিন ধরণী পুরুষেরই সাথে গাহিবে নারীরও জয়'। হয়তো লাইনটি মেয়েদের জন্য সত্যি হয়ে ওঠেনি আজও। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু মেয়েকে হয়তো পদমর্যাদায় সর্বোচ্চ স্তরে দেখা যায় কিন্তু নারীর একটা বিরাট অংশ এখনও পেছনে রয়ে গেছে। সেদিন আর বেশি দেরি নয় যেদিন নারীরা প্রতিবাদের অস্ত্র তুলে নেবে, অথবা কোনও এক অলৌকিক হাত টেনে তুলে আনবে ওই আঁধার থেকে। খুব তাড়াতাড়িই আসবে সেদিন, যেদিন এই সমাজ নারীকে ভোগের বস্তু না ভেবে, মানুষ হিসাবে শ্রদ্ধা করতে শিখবে। ■

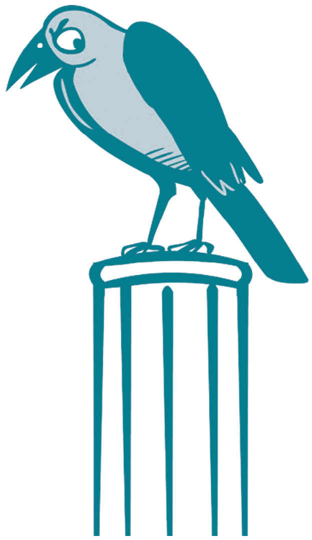

তালাক-এ-নওটঙ্কি

তালাক নিয়ে নাটক বেশ জমে উঠেছে। শেক্সপিয়ার অনেকদিন আগে লিখে গেছেন— All the World's a stage. সারা বিশ্বই যখন এক বৃহৎ রঙ্গভূমি, তখন আমাদের জীবন-মরণের নিয়ন্তা সংসদও তা থেকে বাদ যেতে পারে না। রঙ্গের নটবর হরি, পার্টি-নেতারা যেভাবে নাচান, সেভাবেই পার্লামেন্ট পণ্ডিতরা যে সে নাচের তালে তালে রঙ্গ জমিয়ে তোলেন, তা বলাই বাহুল্য। সবে শেষ হলো, প্রথম পর্বের তালাক-এ-নওটঙ্কি।

সেই পর্বের পার্লামেন্টারি রঙ্গ বেশ জমে উঠেছিল মুসলমান মহিলাদের মুখে-মুখে তিন তালাকের অমানবিক কর্মকাণ্ড নিয়ে। জাগ্রত মুসলমান মহিলাদের সাহসী সংগ্রামে, এই অত্যন্ত গর্হিত প্রথা ধর্মের নামে চালিয়ে আসার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদনের ফলে ব্যবস্থাটি যে বেআইনি ও সংবিধান-বিরোধী, সে বিষয়ে আদালত রায়দান করে। সুপ্রিম কোর্ট স্থির সিদ্ধান্তে নির্দেশ দেয় যে, ছয় মাসের মধ্যে এই অমানবিক ব্যবস্থাটির রদে আইন প্রণয়ন করতে হবে।

সেই উদ্দেশ্যে মোদী সরকার সংসদে একটি বিল পেশ করে Muslim (Protection of Right on Marriage) Bill 2017 নামে। বিলটি লোকসভায় পাশ হয়ে গেলেও রাজ্যসভায় এসে এমন বাধার সম্মুখীন হয় যে, বিলটি পেশ করাই সম্ভব হয়নি। ফলে বিষয়টি আপাতত স্থগিত। বাধা দানের জন্যে যেসব যুক্তির অবতারণা করা হয়, সেগুলি একমাত্র অতিবুদ্ধিমান পার্লামেন্টারি পণ্ডিতদের উর্বর মস্তিষ্কের পক্ষেই সম্ভব।

প্রথমত শোনা যাচ্ছে, মুখে মুখে তিন তালাক যখন সুপ্রিম কোর্টে বেআইনি ঘোষিত হয়েছে, তখন তা নিয়ে আইন করার প্রয়োজন কী! একেবারে ঠিক কথা! দরিদ্র বৃদ্ধা মুসলমান রমণী সাহবানো তালাকপ্রাপ্ত হওয়ায় যে দুর্দশার মধ্যে পতিত হয়েছিলেন, তার উপশমে সুপ্রিম কোর্ট একটি মানবিক আদেশ দেয় এবং বিচারপতি কৃষ্ণ আইয়ার বলেন, No Law is above human Law. কিন্তু আদালতের সেই আদেশকে অগ্রাহ্য করতে মুসলমান-দরদি রাজীব গান্ধী সংবিধান সংশোধন করতেও পশ্চাৎপদ হননি। সুতরাং অনেক মুসলমানপ্রধান দেশে এই অমানবিক আইনটি বহু আগে পরিত্যক্ত হলেও সেকুলার গান্ধী কংগ্রেস সেটি ভারতে বজায় রাখার জন্যে বেআইনিভাবে আইনি বজ্জাতি করতেও দ্বিধা করেনি। আজ সেই গান্ধী কংগ্রেসের মহামাতব্বররা কোমর বেঁধে লেগে পড়েছেন সেটিকে বানচাল করার জন্যে— আইনের প্রয়োজন নেই, এই অজুহাতে।

বিলটি পেশে বাধা দিয়ে রাজ্যসভা ভণ্ডুল করার জন্যে কংগ্রেসি নেতারা দাবি করছেন, বিলটিকে প্রথমে পাঠাতে হবে স্থায়ী সিলেক্ট কমিটিতে। যুক্তিটির সারবত্তায় কংগ্রেসিরা মুখর। প্রশ্ন হলো, সংসদের উভয় কক্ষ গঠিত তো মূলত আলোচনা বা মতবিনিময়ের মাধ্যমে কোনও বিষয়কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে সিদ্ধান্তে আসার জন্য। তাহলে বিলটি পেশ করে আলোচনার সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে যদি সেটি আগেই একটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাতে হয়, তাহলে কোটি কোটি টাকার শ্রাদ্ধ করে এই পার্লামেন্ট বজায় রাখার প্রয়োজনটা কী? কমিটি যা বিচার করবে, তারপর আলোচনারই বা অর্থ কী! তাহলে তো সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সিলেক্ট কমিটিতে পাঠিয়ে পার্লামেন্টে হৈ হট্টগোল, হাতাহাতি করে, প্রায় বিনা পয়সায় পার্লামেন্ট ক্যান্টিনে খেয়ে ডেইলি অ্যালাউন্স নিয়ে বাকি সময়ে ডিলের তদ্বির করলেই হয়।

আমাদের এই সাংসদ মহাজনরা এমনই মনীষাসম্পন্ন যে, যখনই কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনার জন্যে আসে, তখনই সেটির যুক্তিপূর্ণ আলোচনা না করে সেটিকে আরও একটি মহাবুদ্ধিমান কমিটির কাছে পাঠানো হয়, শুধুমাত্র কালহরণের জন্য। যেমন বাবরি মসজিদ-রাম জন্মভূমি বিতর্কটি দীর্ঘদিন সংসদে টালবাহানার পর শেষে সেটি আদালতে পাঠানো হয় ফয়সালার জন্যে। সে সময় দিল্লিতে আমি এক সাংবাদিক সম্মেলনে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্তকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, আপনারা সংসদে ছ'শো লোক ভেবে যা ঠিক করতে পারলেন না, তা বিবেচনার জন্যে পাঠালেন দু-তিনজন বিচারকের কাছে। ওটা আইনের ব্যাপার বলে তিনি এড়িয়ে গেলেন।

কিছু বিজ্ঞ সাংসদ আবার বলেছেন, আদালত যখন তিন তালাককে বেআইনি ঘোষণা করেছে, তখন তা নিয়ে আবার আইনের প্রয়োজন কেন। তাঁদের কথা শুনে মনে হয়, তেনারা মহান ন্যাকাচৈতন্যরূপে এক মূর্খের স্বর্গে বাস করেছেন। এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি গল্প আছে। একটি পুকুরের জল যেন দূষিত না হয়, সেজন্য সকলকে সাবধান করা হলো; কিন্তু সকলে নির্বিকার, অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরে। তারপরে যখন নোটিশ দেওয়া হলো, জল দূষিত করলে শাস্তি পেতে হবে, তখনই সকলের টনক নড়ল এবং কাজের কাজ হলো। গল্পটি বলে, শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, কোনও সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে গেলে, কর্তৃপক্ষের চাপরাশ চাই। শাস্তির বিধান থাকা সত্ত্বেও আইনকে গ্রাহ্য না করার জন্য বাঘা বাঘা উকিল ব্যারিস্টার যেখানে

বিদ্যমান তখন আইন না থাকলে তো কথাই নেই!

তালাক বিলের অসম্পূর্ণতা নির্দেশ করে গান্ধী অনুচর মহাবিজ্ঞরা বলছেন, তিন তালাক যদি শাস্তিযোগ্য হয়ে জেলের ব্যবস্থা করে তাহলে স্ত্রীর ভরণপোষণের কী হবে গা! সত্যিই তো কী গভীর চিন্তা। সাহবানো যখন মাত্র শ'দেড়েক টাকা খোরপোষ দাবি করেছিল, তখন সংবিধান সংশোধনে তালাক সিদ্ধ করে তার জন্যে রাজীব সরকার কী মানবিক ব্যবস্থা করেছিল তা অজানা। বর্তমানে তিন তালাক দেওয়ার পর সেই তালাকপ্রাপ্ত মহিলাদের জন্যে কোন রাজসুখের ব্যবস্থা থাকে, কেউ যদি জানাতে পারেন তাহলে ভালো হয়। চুরি, ডাকাতি, খুনখারাপির জন্যে যাদের জেল বা যাবজ্জীবন হয় সেই চোরের পরিবারের দেখাশোনার জন্যে আইনে কী ব্যবস্থা আছে, কে জানে। অপরাধের জন্যে শাস্তি হলে তার দায়দায়িত্বের ব্যবস্থার জন্যে মহানুভব রাজীব সরকার থেকে কী ব্যবস্থা ছিল বা আছে তা বিশেষভাবে প্রণিধানের বিষয়। কিন্তু সেই ভিত্তিহীন যুক্তি দিয়ে পার্লামেন্টে যে তুফান তোলা যায়, এটাই বাস্তব।

সকলেই জানেন, মুসলমানদের বিয়ে একটি চুক্তিমাত্র এবং কাজির কাজ হলো সেই চুক্তিটিকে বিধিবদ্ধ করা। বিয়ের সময় পরস্পরের সম্মতি আদায়ে চুক্তি করতে কাজি ও সাক্ষীর দরকার। কিন্তু তিন তালাক দিয়ে বিয়ে ভঙ্গ করতে কোনও চুক্তি, কাজী ও সাক্ষীর প্রয়োজন নেই। বাঃ কী মহানুভব পার্সোনাল 'ল বা আইন। সেই আইনের সারবত্তা প্রমাণ করতে প্রাক্তন আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার কপিল সিব্বাল মুখর হয়েছেন। বলিহারি ব্যারিস্টার তার ভোম্বলদাস বুদ্ধির পরকাষ্ঠা দেখে! এই মহামহিম বিজ্ঞ দল আমাদের পার্লামেন্ট প্রকম্পিত করেছেন বলেই না আজ আমাদের এই অবস্থা!

ওসব ব্যারিস্টারি অতি বুদ্ধিকে পাশ কাটিয়ে সাধারণ বুদ্ধিতে যদি বিচার করা যায়, তাহলে দেখা যাচ্ছে, চুক্তি করতে হলে যেমন শর্ত আছে, চুক্তি ভঙ্গ করতেও তেমনি শর্ত থাকা আবশ্যক। ইসলামিক নিকাহ্ নামাতে নিয়ম আছে, বিয়ের সময় দেনমোহরের কথা, যা তালাকের সময় তালাকপ্রাপ্তার পাওয়ার কথা। কিন্তু সেটির মূল্যের এতো অবনয়ন ঘটে যে, সেটা প্রায় মূল্যহীন হয়ে ওঠে। সাহবানোর যখন নিকাহ হয় সেই যৌবন বয়সের মূল্য এবং যখন তালাক হয় তখন তার মূল্য কী দাঁড়ায় সেটা বোফর্স ডিল করার সময় রাজীব সরকারের খেয়াল থাকার কথা নয়। ইসলামিক নিয়মে যে বিবাহ চুক্তি কাজি ও সাক্ষী দ্বারা সিদ্ধ হয়, সেই চুক্তি ভঙ্গ করতে গেলেও একটি আইনি স্বীকৃতি ও তজ্জনিত যে ক্ষতিপূরণ তথা খোরপোষের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যকীয়, এটা তো স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ। নিকাহনামার চুক্তিতে কিন্তু এমন কোনও কথা নেই যে, একপক্ষ নিজের খেয়াল খুশিমতো সেই চুক্তি লঙ্ঘন করতে পারে। কপিল সিব্বাল যতই কোর্টে বা পার্লামেন্টে হ্রেষারব করুন, একটি সিভিল কনট্র্যাক্টে বিয়ে করতে গেলে যেমন নথিভুক্তিকরণের প্রয়োজন, তেমনি চুক্তি ভঙ্গ করতে গেলেও নথিভুক্তিকরণের প্রয়োজন, এটা তো সাধারণ বুদ্ধির বিচার।

আগে কথা ছিল, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ হয় বিধাতাকে দিয়া। কিন্তু এখন সেই বিধাতার স্থান নিয়েছে আইন, এবং দেশ চলে Rule of Law অনুযায়ী। প্রতিটি জন্ম যেমন অবশ্য নথিবদ্ধ হওয়া একান্ত দরকার, নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে— মৃত্যুও তেমনি নথিবদ্ধ হওয়া অত্যাবশ্যক, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে। ঠিক একইভাবে, বিবাহ ও বিবাহভঙ্গ আইনগতভাবে বিধিবদ্ধ হওয়া সুনির্দিষ্ট করার বিরুদ্ধে কোনও যুক্তি থাকতে পারে না।

মুসলমান বিয়ে তো দীর্ঘদিন ধরে কাজির দ্বারা নথিবদ্ধ; হিন্দু বিয়েও এখন রেজিস্ট্রি করা একান্তভাবে বাধ্যতামূলক। হিন্দু কোড বিলে বিবাহবিচ্ছেদের জন্য কোনও তিন তালাকের ব্যবস্থা নেই, আদালতে গিয়ে সেটি ফয়সালা করতে হয় এবং সেখানেই Alimony-র বিচার বিবেচনার ব্যবস্থা। কিন্তু মুসলমান বিবাহবিচ্ছেদ যেন সভ্যসমাজের নিয়মকানুনের বাইরে মগের মুলুকের ব্যাপার। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যে চুক্তি, সেটি স্বামীর খেয়ালখুশিমতো ভাঙা যায়, সাহবানোর মতো কোনও দায়দায়িত্ব না নিয়ে। এবং মুসলমান মোল্লা ও সিব্বালের মতো কেনা হিন্দু মোল্লারা এই বেনিয়মকে বজায় রাখার বেহায়াপনা প্রকাশ করতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করছেন না, এটাই ভারতীয় গণতন্ত্রের এক বিস্ময়।

আসলে বিয়ে করতে যেমন আদালতে রেজিস্ট্রি করতে হবে, তেমনি বিয়ে ভঙ্গ করতেও আদালতের অনুমতিতে রেজিস্ট্রি করতে হবে। এটাই হবে সরল ভারতীয় আইন, এর কোনও হিন্দু, মুসলমান, পার্শি, খ্রিশ্চান, বৌদ্ধ, জৈন নেই। পার্সোনাল ল-এর বুজরুকির সঙ্গে আইনের শাসনের কোনও প্রভেদ থাকবে না? পরস্পরের সম্মতিক্রমে যেমন বিয়ে, তেমনি পরস্পরের সম্মতিতেই আদালতে নথিবদ্ধ হতে হবে বিবাহভঙ্গ। যিনি বিবাহভঙ্গ করতে চান, বিবাহবঙ্গের সম্পূর্ণ তাঁর এবং তাঁকে অপরপক্ষের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে হবে। তবে বিবাহভঙ্গের আবেদন হলে, অপর পক্ষের সেটিতে বাধা দেওয়ার বা আটকে দেওয়ার বা টালবাহানা করার কোনও ক্ষমতা থাকবে না। আদালতের নির্দেশ উভয়পক্ষকে মেনে নিতে হবে এবং যে পক্ষ কর্মহীন, সেই পুরুষ কিংবা স্ত্রীর জন্যই কেবলমাত্র alimony-র প্রশ্ন বিবেচ্য।

বিবাহ ও বিবাহভঙ্গ সহজতর করার জন্য সম্পূর্ণ আলাদাভাবে একটি বিধিবদ্ধ বিবাহ আদালতের প্রয়োজন। অযথা হয়রানি ও কালক্ষেপ করা প্রতিরোধে ছয় মাস সময়সীমার মধ্যে নিষ্পত্তি হওয়া বিধেয়। একই যুগল, এলিজাবেথ টেলর ও রিচার্ড বার্টনের মতো যে কেউ বিবাহভঙ্গ ও পুনর্বিবাহ করতে পারেন এবং তাতে কোনও বিধিনিষেধের প্রশ্ন নেই। তবে বিবাহবহির্ভূত ব্যাপারে উভয়ের সম্মতিতে সম্পর্ক থাকতে পারে, যা আইনসিদ্ধ না হলেও অপরাধযোগ্য হবে না। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রাপ্তবয়স্কদের দৈহিক সম্পর্কের গাঁজাখুরি, অবিলম্বে আইনবহির্ভূত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। তবে এই সহজ সামাজিক নিয়মগুলি আইনে পরিণত করা ভারতে বর্তমানে খুবই দুরূহ। কেননা হট্টগোল করা ছাড়া পার্লামেন্টারি প্র্যাকটিস এখন কঠিন বাস্তব, আইন করা তো দূর অস্ত্। ■

নিরলস সংগ্রামের মহানায়ক রাসবিহারী বসু

মণীন্দ্রনাথ সাহা

২৩ ডিসেম্বর, ১৯১২ সাল। সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক উপলক্ষে শোভাযাত্রা চলেছে দিল্লি মহানগরীর রাজপথ দিয়ে। হাতির পিঠে চেপে চলেছেন সস্ত্রীক বড়লাট হার্ডিঞ্জ সাহেব। পেছনে অন্যান্য রাজকর্মচারী, রাজা-মহারাজা ও মোসাহেবের দল। পথের দু'পাশের বাড়িগুলিতে অসম্ভব ভিড়। পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের তিনতলা বাড়িটাতে পুরুষদের স্থান একতলা ও তিন তলায়। দোতালাটা শুধু মেয়েদের জন্য। হঠাৎ এক সুবেশী তরুণী এসে আশ্রয় নিল সেখানে। তার নাম লীলাবতী। শোভাযাত্রা যখন চাঁদনীচকে এসে পড়েছে এবং দোতালার ঠিক নীচেই হাতির পিঠে উপবিষ্ট সস্ত্রীক বড়লাট, তখন সহসা প্রচণ্ড বিস্ফোরণে রাজপথ থরথর করে কেঁপে উঠল। বিস্ফোরণের ধোঁয়া সরে গেলে দেখা গেল হাতির মাহুত মারা গেছে। লাটবাহাদুরের অবস্থাও লাটে ওঠার মতো। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হলো। তার হয়ে শপথ গ্রহণ করলেন অন্য একজন রাজপুরুষ।

আক্রোশে ফেটে পড়ল বিদেশি শাসক। রাজভক্তরা সবাই একাযোগে নিন্দা করতে লাগলেন। সবাইকে ছাপিয়ে গেলেন সরকারের একান্ত অনুগত ভক্ত, দেরাদুন বনবিভাগের বিশিষ্ট কর্মচারী রাসবিহারী বসু।

রাজকর্মচারীদের উপস্থিতিতে দেরাদুনে এক প্রতিবাদ সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি প্রচণ্ড ঘৃণা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন। ধিক সেই পাষণ্ড আততায়ীকে, যে মাহামান্য বড়লাট বাহাদুরকে ঘৃণ্য পন্থায় আক্রমণ করেছে। আমার অনুরোধ, আততায়ীকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে চরম শাস্তি দেওয়া হোক বলতে বলতে রাগে, দুঃখে কেঁদে ফেললেন রাসবিহারী। তারপর চোখ মুছতে মুছতে সভামঞ্চ থেকে নেমে গেলেন তিনি। শাসক সম্প্রদায় তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর দহরম-মহরম। এমনকী, শ্বেতাঙ্গ-সমাজের মধ্যমণি স্বয়ং ভারত সরকারের মিলিটারি সেক্রেটারিও রাসবিহারীর ভক্ত। নিজে তিনি বাংলা শেখেন তাঁর কাছে। শুধু তাই নয়, কী করে বাংলার বিপ্লবীদের দমন করা হবে, সে বিষয়েও তাঁর শ্রেষ্ঠ পরামর্শদাতা রাসবিহারী। কত গুরুতর পরামর্শ তাঁরা করেছেন রাসবিহারীর সঙ্গে।

কিন্তু কে এই আক্রমণকারী? সুবেশা তরুণী লীলাবতী কোথায় গেল? এই মহাযজ্ঞের হোতাই বা কে?

১৯১৩ সালের ১৭ মে আবার বোমা নিক্ষিপ্ত হলো লাহোরের লরেন্স গার্ডেন্স-এ অবস্থিত পুলিশ ক্লাবে। প্রাণ দিল ক্লাবের একজন চাপরাশি। পুলিশ দিশেহারা।

১৯১৩ সালের ২১ নভেম্বর কলকাতার রাজাবাজারের আপার সার্কুলার রোডের এক গোপন আস্তানায় হানা দিয়ে পুলিশ কিছু সূত্র খুঁজে পেল। সেই সূত্রে ধরা পড়লেন দুর্ধর্ষ বিপ্লবী অমৃত হাজরা, দীনেশ দাসগুপ্ত, চন্দ্রশেখর দে, সারদাচরণ গুহ-সহ আরও কয়েকজন। এর পরে বড়লাটের ওপর বোমা নিক্ষেপের ব্যাপারে যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁদের মধ্যে বালমুকুন্দ, অবোধ বিহারী, বসন্ত বিশ্বাস প্রমুখ ধরা পড়লেন। ২৭ ফেব্রুয়ারি কৃষ্ণনগরে বসন্ত বিশ্বাস ধরা পড়লে রহস্যের জট খুলে গেল। সেদিনের সেই তরুণী লীলাবতী আসলে বাংলার দামাল কিশোর বসন্ত বিশ্বাস। লরেন্স গার্ডেন্স-এর পুলিশক্লাবের বোমা নিক্ষেপটিও তাঁরই কীর্তি। তখন তাঁর নাম ছিল 'বিষিন দাস'। আর এই মহাযজ্ঞের প্রধান হতো হলেন আর এক বাঙালি, তাঁর নাম রাসবিহারী। চন্দননগরের মহামান্য সরকার বাহাদুরের একান্ত রাজভক্ত প্রজা রাসবিহারী। ভারত তথা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু।

রাসবিহারী! পরিচিত প্রতিটি মানুষ স্তম্ভিত। বলে কী! রাসবিহারী তো পুলিশের গুপ্তচর! নইলে বড় বড় সরকারি কর্মচারীর সঙ্গে তাঁর এত মাখামাখি কেন? হ্যাঁ, সবাই এই ধারণাই করতেন তাঁর সম্বন্ধে। পুলিশ রিপোর্টেও তাই বলছে—

...'If is the general belief there amougst the Bengali Community that Rash Behari was a Police Spy and used to Supply information to the C.I.D. Officers.' (The weekly report of the intelligence Branch, Bengal, dated July 20, 1914. Two Great Indian Revolutionaries; — Uma Mukherjee.)

প্রধান হোতার নাম জানার পর সবচাইতে বেশি বিস্মিত হয়েছিল শাসক গোষ্ঠী। শ্রেষ্ঠ রাজভক্ত কিনা শ্রেষ্ঠ রাজদ্রোহী! ধর তাঁকে। কিন্তু কোথায় রাসবিহারী। দেরাদুন থেকে তল্পি-তল্পা গুটিয়ে ততক্ষণে তিনি হাওয়া। তন্নতন্ন করে সারা ভারত চষে ফেলা হল, কিন্তু কোথাও তাঁর সন্ধান পাওয়া গেল না।

রাসবিহারী কিন্তু চুপচাপ বসে নেই। ইংরেজকে সরাতে গেলে শুধু বিপ্লবী তরুণ দলই যথেষ্ট নয়। তাঁরা উপযুক্ত হলেও তাঁদের হাতে উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র নেই। সেনাবাহিনীর হাতে অস্ত্র আছে। তাঁদের দলে টানতে হবে। শুরু হলো সেনাবাহিনীকে দলে টানার কাজ। রাসবিহারীর ডাক শুনে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে চলে এলেন বিপ্লবী দল। এলেন শচীন সান্যাল, বিষেন

সিংহ, জগৎ সিংহ, বিভূতি হালদার, প্রিয়নাথ, বিশ্বনাথ পাঁড়ে প্রমুখ দুঃসাহসী তরুণ দল। এলেন দিল্লা সিংহ, মঙ্গল পাণ্ডে, নরেন ব্যানার্জী, ভাই পরমানন্দ ও আরও অনেকে। আমেরিকা থেকে ছুটে এলেন গদর পার্টির কর্তার সিংহ। সঙ্গে নিয়ে এলন চার হাজার তরুণ শিখ। আর এলেন মারাঠা যুবক পিংলে।

এলাহাবাদ, বেনারস, জব্বলপুর, দিল্লি, বাংলা, অম্বালা, রাওয়ালপিণ্ডি, মীরাট-সহ দেশের বহু ক্যান্টনমেন্টের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেল। ১৯১৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বিদ্রোহের দিন ঘোষণা করা হলো। কিন্তু কৃপাল সিংহ ও নবাবখান নামে দুটি ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তে ইংরেজবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল অপ্রস্তুত ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপর। ফলে সবাইকে বন্দি হতে হলো।

আশাভঙ্গের বেদনায় রাসবিহারী চলে এলেন বাংলায়। এলেন কলকাতায়, তারপর চন্দননগর, সবশেষে নবদ্বীপে। শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁকে বললেন, পুলিশ তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। অনেক ভেবে চিন্তে তিনি দূরে যাবারই সিদ্ধান্ত নিলেন। শেষ পর্যন্ত ১২ মে ১৯১৫ সালে জাপানি জাহাজ 'সানুকি মারু'-তে চেপে জাপান অভিমুখে রওনা দিলেন।

জাপানে পৌঁছানোর পর সেখানকার নাগরিকত্ব পাবার জন্য ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে রাসবিহারীর বিবাহ হয় এক রুটি কারখানার মালিক মি. সোমার মেয়ে তোসিকো'র সঙ্গে। ১৯২৩ সালের জুলাই মাসে তিনি স্বীকৃতি পেলেন জাপানি নাগরিক বলে।

জাপানে রাসবিহারী তাঁর কাজ করে চলেছেন একনিষ্ঠ ভাবে। ১ সেপ্টেম্বর ১৯৪২ সালে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হলো আনুষ্ঠানিক ভাবে জাপানে। বাহিনী পরিচালন কমিটি তৈরি হলো মোহন সিংহ, এন. রাঘবন, কে. পি. মেনন, কিউ. গিলানিদের নিয়ে। সবার উপরে সভাপতি রাসবিহারী বসু স্বয়ং। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে মোহন সিংহ নিজেকে বাহিনীর সর্বেসর্বা ভেবে বাহিনীর পরিপন্থী কাজ করে বাহিনীর পদ থেকে বরখাস্ত ও বন্দি হলেন রাসবিহারীর নির্দেশে।

রাসবিহারী বসুর শরীর ভাল যাচ্ছিল না। মাঝে মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। তাই সুভাষকে ডাক পাঠিয়েছেন আজাদ হিন্দ বাহিনীর দায়িত্বভার তুলে নেবার জন্য।

রাসবিহারীর ডাক শুনে সাবমেরিন-যোগে সুভাষচন্দ্র বসু জাপানে এসে পৌঁছেছেন। ৪ জুলাই রাসবিহারী আই এন এ-সহ সবকিছুর দায়িত্ব তুলে দিলেন সুভাষের হাতে। সে এক অন্য ইতিহাস।

স্বাস্থ্য কিছুদিন থেকেই ভাল যাচ্ছিল না। রাসবিহারীর অসুস্থতার খবর শুনে স্বয়ং জাপান সম্রাট তাঁকে সম্মানিত করলেন জাপানের শ্রেষ্ঠ সম্মান— 'দি সেকেন্ড অর্ডার অব দি মেরিট অব দি রাইজিং সন' পদক দিয়ে। ১৯৪৫ সালের ২১ জানুয়ারি সব কিছুর পরিসমাপ্তি ঘটল টোকিয়োর হাসপাতালে। সে খবর শুনে শ্রদ্ধায় মাথা নোয়ালেন মহামান্য জাপ সম্রাট। সঙ্গে সঙ্গে তিনি শবাধার বহনের জন্য রাজশকট পাঠিয়ে দিলেন, যা কেবলমাত্র রাজ পরিবারের লোকেদের জন্যই নির্ধারিত। একমাত্র রাসবিহারী ছাড়া এধরনের সম্মান প্রদর্শনের আর দ্বিতীয় কোনো নজির নেই জাপানের ইতিহাসে।

বর্মার পরবর্তী বিপ্লবী সরকারের প্রধানমন্ত্রী থাকিন নু রাসবিহারীর মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর শ্রদ্ধাভরে বলেছিলেন— 'It Netaji comes out in the light as Gariboldi of the movement, Rash Behari's part in the drama was more than that of a marrini.' অর্থাৎ— 'স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজী যদি গ্যারিবল্ডির সমকক্ষ হন, তবে রাসবিহারীর ভূমিকা নিঃসন্দেহে ম্যাৎসিনির।'

রাসবিহারীর জীবনে একটাই মাত্র সাধ ছিল জন্মভূমিতে ফিরে এসে মৃত্যুবরণ করা। সে সাধ তাঁর পূর্ণ হয়নি। তার আগেই তিনি চলে গেছেন। দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম করে, মৃত্যুকে তুচ্ছ করে সেদিন যাঁরা হাসিমুখে জীবনের জয়গান গেয়েছিলেন, রাসবিহারী সেই সীমিত সংখ্যক ঘরছাড়া পথিকদেরই একজন।

আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে, স্বাধীনতা সংগ্রামে কার কতখানি অবদান, তাই নিয়ে মস্তবড় ইতিহাস রচিত হয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে। কোথায় সেখানে রাসবিহারীর স্থান? দেশের কটি ছেলে-মেয়ে জানে জীবনভর তাঁর এই নিরলস সংগ্রামের কাহিনি?

(রাসবিহারী বসুর প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত)

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন
মিউচুয়াল ফান্ডে
SIP
SYSTEMATIC INVESTMENT PLAN
করুন
উন্নতি করুন
DRS INVESTMENT
Contact :
9830372090
9748978406
Email : drsinvestment@gmail.com
uti UTI Mutual Fund
HDFC MUTUAL FUND
SBI MUTUAL FUND A partner for life.

পরলোকে স্বামী সর্বানন্দ মহারাজ

পূর্বাশ্রমের নাম নেপাল চন্দ্র লাহা। বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার কৈথনে ১৯৮৪ সালে

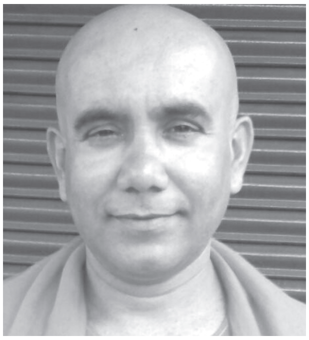

স্বয়ংসেবক হন। পড়াশুনা শেষ করে ১৯৯৬ সালে বর্ধমানের গুসকরায় বিস্তারক হিসেবে আসেন। ২০০০ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত প্রচারক হিসেবে প্রথমে বাঁকুড়া জেলার খাতড়া নগর, পুরুলিয়া জেলার মানবাজার খণ্ডপ্রচারক, পরে উত্তরবঙ্গের কার্শিয়াং, বীরপাড়া, মালদা জেলার সামসীতে সঙ্ঘকাজ বিস্তারে জীবনের অমূল্য সময় দান করেন। অধ্যাত্ম জীবনের আকর্ষণে ২০১২ সালে কার্শিয়াংয়ের বেদান্ত মঠে ব্রহ্মচারীর জীবন স্বীকার করেন। ২০১৪ সালে হরিদ্বারে সন্ন্যাস দীক্ষা হয়। পরে বার্নপুর আশ্রমে কিছুকাল অতিবাহিত করেন। বর্ধমানের পুতুন্ডা আশ্রমে থাকাকালীন আলসার ও টিবি রোগে আক্রান্ত হলে ২০১৭-র নভেম্বর মাসে তাঁকে তাঁর বাড়িতে আনা হয় এবং ২৫ ডিসেম্বর চেন্নাই অ্যাপোলো হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। ১ জানুয়ারি চেন্নাই থেকে বাড়ি নিয়ে আসার পথে হাওড়া স্টেশনেই তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত হয়। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৭ বছর। তিনি মা, ৬ দাদা, ২ দিদি এবং অসংখ্য গুণমুগ্ধ অনুগামী রেখে গেছেন।

পরলোকে বসিরহাটের শ্যামারাণী নাথ

সঙ্ঘ পরিবারের কাছে মাতৃসমা বসিরহাটের শ্যামারাণী নাথ সাধনোচিত ধামে গমন করেছেন। গত ১৬ পৌষ, ১ জানুয়ারি কল্পতরু দিবসে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। ৪ পুত্র ও ৪ কন্যার গর্ভধারিণী তিনি। যদিও বড় পুত্র তুলসীকুমার নাথ আগেই গত হয়েছেন। দ্বিতীয়পুত্র সুভাষচন্দ্র নাথ বর্তমানে সঙ্ঘের জেলা কার্যকারিণীর সদস্য, চতুর্থপুত্র মধুময় নাথ সঙ্ঘের প্রচারক। বর্তমানে অখিল ভারতীয় ক্রীড়া ভারতীর সহ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। বাকি পুত্র ও নাতি সবাই স্বয়ংসেবক। তাঁর পুরো পরিবার সঙ্ঘময়। তিনি নিজেও রাষ্ট্রসেবিকা সমিতির দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছেন।

তখনকার নিয়ম অনুসারে মাত্র ৯ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ি আসেন। অল্পদিনের মধ্যেই পরিবারের মধ্যে সবার প্রিয়পাত্রী হয়ে যান। তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা হলেও ভাগবদ্‌গীতা তাঁর মুখস্থ ছিল।

নিজ চেষ্টায় সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় তিনি বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। অভাবের সংসারে গৃহকর্ত্রী হিসেবে সব দায়িত্ব হাসিমুখে সামলেছেন।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাজ তাঁর প্রাণের কাজ ছিল। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার সময়ে ভূমিগত স্বয়ংসেবক, কার্যকর্তা ও প্রচারকদের তিনি মায়ের মতো আগলে রেখেছিলেন। সঙ্ঘের দুঃসময়ে তিনি সকলের মাথায় স্নেহাঞ্চল বিছিয়ে দিয়ে রেখেছিলেন। রান্না করে নিজে হাতে খাইয়েছেন সুদর্শনজী, যাদবরাও যোশী, বাবুরাও পালধীকর, বসন্তরাও ভট্ট, বালকৃষ্ণ নায়েক, শ্রীকৃষ্ণ মোতলগ, বর্তমান সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত-সহ বহু প্রচারক ও কার্যকর্তাকে। বাংলা প্রদেশের অমল কুমার বসু, কালিদাস বসু, গজানন বাপট, অনন্তলাল সোনী, রাধাগোবিন্দ পোদ্দার, বিদ্যুৎ দত্ত, রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির শ্রীমতী মহুয়া ধর, প্রতিমা বসু-সহ বহু কার্যকর্তা তাঁর স্নেহ লাভে ধন্য হয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হলো, তিনি পরিবারের সবাইকে বুঝিয়ে তাঁর শ্বশুরের স্মরণে সরস্বতী শিশু মন্দির এবং সঙ্ঘ কার্যালয় করার জন্য জমি দান করা।

* * *

মেদিনীপুর নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক রঞ্জিৎ কুমার মাঝি গত ৫ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি মা, স্ত্রী, ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনি-সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি মেদিনীপুর বক্সিবাজার শিশু মন্দিরে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন।

প্রয়াত অলোক চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণসভা

গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭, বেহালা শীলপাড়া ভজনাশ্রমে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বেহালা নগরের প্রাক্তন সঙ্ঘচালক প্রয়াত অলোক বরণ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক ও প্রবীণ স্বয়ংসেবক অসীম কুমার মিত্রের পাঠানো স্মৃতিবার্তায় স্মরণসভার মূলসুরটি ফুটে উঠল নিম্নোক্ত শব্দবন্ধের মাধ্যমে— ‘‘অলোকদার বাড়ির সামনে (১৪ ডিসেম্বর, ২০১৭) দাঁড়িয়ে বারবার নিজেকে বড্ড ছোটো বলে মনে হচ্ছিল এই ভেবে যে অলোকদা যেভাবে সঙ্ঘের আদর্শ নিজের মনের মধ্যে শুধু গেঁথে নেওয়া নয়, তাকে বাস্তবায়িত করেছিলেন, আমরা ক'জন তা পেরেছি?’’

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, বিজেপি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের পক্ষ থেকে তাঁর জীবনের জানা-অজানা বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তি তাঁর সম্বন্ধে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। সবার বক্তব্যের মূলকথা ছিল যে অলোকদার জীবন ছিল সদর্থক এবং সাংগঠনিক বিষয়ে খুবই দূরদর্শী। উল্লেখ্য, অলোকদার পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর পুত্র অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় অলোকদার লেখা একটি কবিতা স্মরণসভায় পাঠ করেন। উল্লেখ্য, অলোকদার পুত্র অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় প্রান্ত পরিবার প্রবোধন প্রমুখ অমরকৃষ্ণ ভদ্রের হাতে শ্রদ্ধানিধি অর্পণ করেন।

আবিষ্কার

নবাঙ্কুর

চশমা

চশমা মানে দুটো কাচের টুকরো ফ্রেমে করে চোখের সামনে দেওয়া। ওই কাচের মধ্যে দিয়ে দেখলে যাদের চোখ খারাপ তারাও ভালো দেখতে পায়। গগলস্ বা সানগ্লাস পরলে সূর্যের আলোতে ভালো দেখা যায়। অনেক সময় আল্ট্রাভায়লেট রশ্মির থেকেও

চোখকে রক্ষা করে এই রঙিন কাচ। চোখের সুরক্ষার জন্যে অনেককেই সেফটি গ্লাস পরতে হয় চোখে যাতে আঘাত না লাগে।

খ্রিস্টের জন্মের এক হাজার বছর পর মানুষ আবিষ্কার করে কিছু বিশেষ ধরনের কাঁচ, যা দিয়ে ছোট জিনিস ভালো দেখতে পাওয়া যায়। কাঁচের আবিষ্কার অবশ্য খ্রিস্টের জন্মের অনেক আগেই হয়ে গিয়েছিল। প্রথম প্রথম কাঁচের গুলি দিয়ে পড়া বা লেখার চেষ্টা করতেন চার্চের কিছু সন্ন্যাসী।

একেবারে স্বচ্ছ কাঁচ তৈরি হতে সেগুলো দিয়ে বল বানিয়ে দেখার চেষ্টা করত লোকে। ইটালির ভেনিস শহরের প্রথম ভালো 'রিডিং স্টোন' তৈরি করা শুরু হয়। এই পাথর বইয়ের পাতার ওপর রেখে পড়া হতো। তারপর ক্রমে লোকে বুঝতে পারে যে কাঁচের টুকরোটাকে চোখের সামনে ধরলে কাজটা আরও সহজ আর ভালো হচ্ছে। অনুমান করা হয়, ফ্রেমে কাঁচ ভরে প্রথম চশমা ইটালির পিসাতে ১২৬৮ খ্রিস্টাব্দে পাওয়া গিয়েছিল। যদিও কে আবিষ্কার করেছিলেন সেটা জানা যায়নি।

তবে এর পর থেকে বেশ কিছু শিল্পীর আঁকাতেই চশমা চোখে লোকজনকে দেখা গেছে। ১৪০০ খ্রিস্টাব্দে ফ্লোরেন্স শহরটিতে বেশ ভালো চশমা (প্রধানত লেন্স) তৈরি হতো। তখন এটা ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, তিরিশ বছর বয়স থেকে মানুষের চোখ খারাপ হতে শুরু করে এবং প্রতি ৫ বছর অন্তর পাওয়ার বাড়ার জন্যে চশমা বদল করতে হয়। এই সময়ে ইটালি থেকে প্রচুর পরিমাণে দেশবিদেশে রপ্তানি হতো নানা রকমের চশমা। সেগুলোর দাম খুব একটা বেশি ছিল না। কারণ ধরে নেওয়া হয়েছিল যে চশমা জীবনের এক অভিন্ন অঙ্গ— গরিব, বড়লোক সবারই প্রয়োজনের জিনিস।

এরপর ষোলশো এবং সতেরোশো শতাব্দীতে জার্মানি দারুণ দারুণ সব ফ্রেম বানাতে শুরু করে। লেন্স তৈরিতে অবশ্য তখনও ইটালিই সেরা। এই ফ্রেমগুলো হয় হাতে ধরা, নয় তো রিবন দিয়ে বাঁধা, নয়তো নাকে বসানো (প্রিন্স নেজ) ধরনের ছিল।

আমরা যে ধরনের চশমা দেখি সেটা তৈরি হয় ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে। এডুয়ার্ড স্কার্লেট নামে এক চোখের ডাক্তার এটা আবিষ্কার করেন।

প্লাস আর মাইনাস পাওয়ার মানে প্রেসবায়োপিয়া (বা হাইপারমেট্রোপিয়া— কাছের জিনিস ভাল করে দেখতে না পাওয়া— লং সাইট) বা মায়োপিয়া (দূরের জিনিস ভাল করে দেখতে না পাওয়া— শর্ট সাইট)। এটি হলে দু'ধরনের লেন্স ব্যবহার হয়— কনভেক্স (উত্তল) বা কনকেভ (অবতল)।

১৭৮৪-তে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন আমেরিকাতে বাইফোকাল চশমার আবিষ্কার করেন। তাঁর প্রেসবায়োপিয়া ও মায়োপিয়া দুটোই ছিল। তাই চশমা বদল করতে করতে ক্লান্ত হয়ে তাঁর মাথায় বাইফোকাল তৈরির চিন্তাটা প্রথম আসে। অ্যাস্টিগমাটিজম নামের চোখের অসুখের জন্যে সিলিন্ড্রিকাল লেন্সের আবিষ্কার হয় ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে। ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী জর্জ এয়ারি এই আবিষ্কারটি করেন।

এরপর নানা রকমের চশমা, চশমার কাচ আর ফ্রেম বাজারে আসতে থাকে। জামাকাপড়ের মতন চশমাও এক ধরনের ফ্যাশন হয়ে দাঁড়ায়। এখন এত রকমের চশমা পাওয়া যায় বাজারে যে গোনা ভার— বাইফোকাল থেকে এখন ট্রাইফোকাল, থ্রিডি প্রোগ্রেসিভ ফোকাস, অ্যাডজাস্টেবেল ফোকাস, ফোটোক্রোমাটিক কত রকমের চশমার কাচ। এর মধ্যে বেশ কিছু ঠিক কাচও নয়, অনেক রকম কৃত্রিম জিনিসেরও ব্যবহার হচ্ছে কাচের বদলে। এখন আবার মানুষ চশমা পরা ছেড়ে কন্ট্যাক্ট লেন্সও পরছে চোখে।

(সংগৃহীত)

ভারতের পথে পথে

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি

উত্তর কলকাতায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির বিশাল অট্টালিকা ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুর তৈরি করান। আগে এটি নীলমণি ঠাকুরের আটচালা ছিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ও মৃত্যু হয় এই বাড়িতেই। বাংলা সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ঠাকুরপরিবারের নানান স্মৃতি এখানে জড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' লেখার ঘর, দক্ষিণের বারান্দা আজও যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। ২৫শে বৈশাখ দিনটি রবীন্দ্রভক্তদের সমাগমে মুখর হয়ে ওঠে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দপ্তর রয়েছে এই বাড়িতে। রবীন্দ্রস্মারক নিয়ে গড়ে উঠেছে মিউজিয়াম। প্রতি মঙ্গলবার থেকে রবিবার দর্শনার্থীদের জন্য খোলা থাকে। সোমবার ও সরকারি ছুটির দিন বন্ধ থাকে।

জানো কি?

মানুষের শরীরে :

- ২০৬ খানা হাড় রয়েছে।
- পেশীর সংখ্যা ৬৩৯।
- বৃক্ক বা কিডনি দুটি।
- হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠ ৪টি।
- মাথার খুলিতে ২২টি হাড় আছে।
- দুধের দাঁত ২০টি হয়।
- পাঁজরের হাড় ২৪টি। ১২টি করে।

ভালো কথা

বিতানের বড় মন

বাড়ি থেকে আমাদের স্কুল বেশি দূরে নয়। হেঁটেই যাই। আমাদের বাড়ির দশটা বাড়ির পর বিতানদের বাড়ি। বিতান আর আমি একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়ি। ও আমার সহপাঠী হলেও বন্ধু নয়। কম কথা বলে। সবাই ওকে 'হাবাগোবা' বলে রাগায়। সেদিন খুব শীত পড়েছে। রোদের দেখা নেই। বিতান একটা নতুন কম্বল নিয়ে স্কুলে যচ্ছে। আমরা রাস্তাতেই ওকে রাগাতে শুরু করলাম। বিতান কোনোদিনই রাগ করে না। অবাক হয়ে আমরা দেখলাম— আমাদের স্কুলের গেটের পাশে রাস্তার এক ভিখারিণীকে বিতান কম্বলটা দিল। ভিখারিণী ওর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করল। বিতানের বড় মনের পরিচয় পেয়ে সেদিন আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল।

স্নেহাংশু চক্রবর্তী, অষ্টম শ্রেণী, খাতড়া, বাঁকুড়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

আকাশ

রিম্পা পোল্লে, দশম শ্রেণী, শ্যামপুর, হুগলী

মাথার ওপর আকাশ
আর আকাশতলে মাটি,
সেই মাটি থেকে জন্ম নিল
কত সবুজ সাথি।
সবুজ দিয়ে ঘেরা এই
বিশ্বভুবন জানি
আকাশটাও খুবই সুন্দর
আমরা সবাই মানি।

আকাশ যখন মেঘমুক্ত
মেলে দিয়ে ডানা
পাখির যেন নীল আকাশে
উড়তে নেই যে মানা।
দিনের বেলা পুব আকাশে
সূর্য যেমন ওঠে
রাতের বেলা তারা-রা তেমনি
আকাশ ভরে রাখে।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা ।। অভিমন্যু ।। ৭

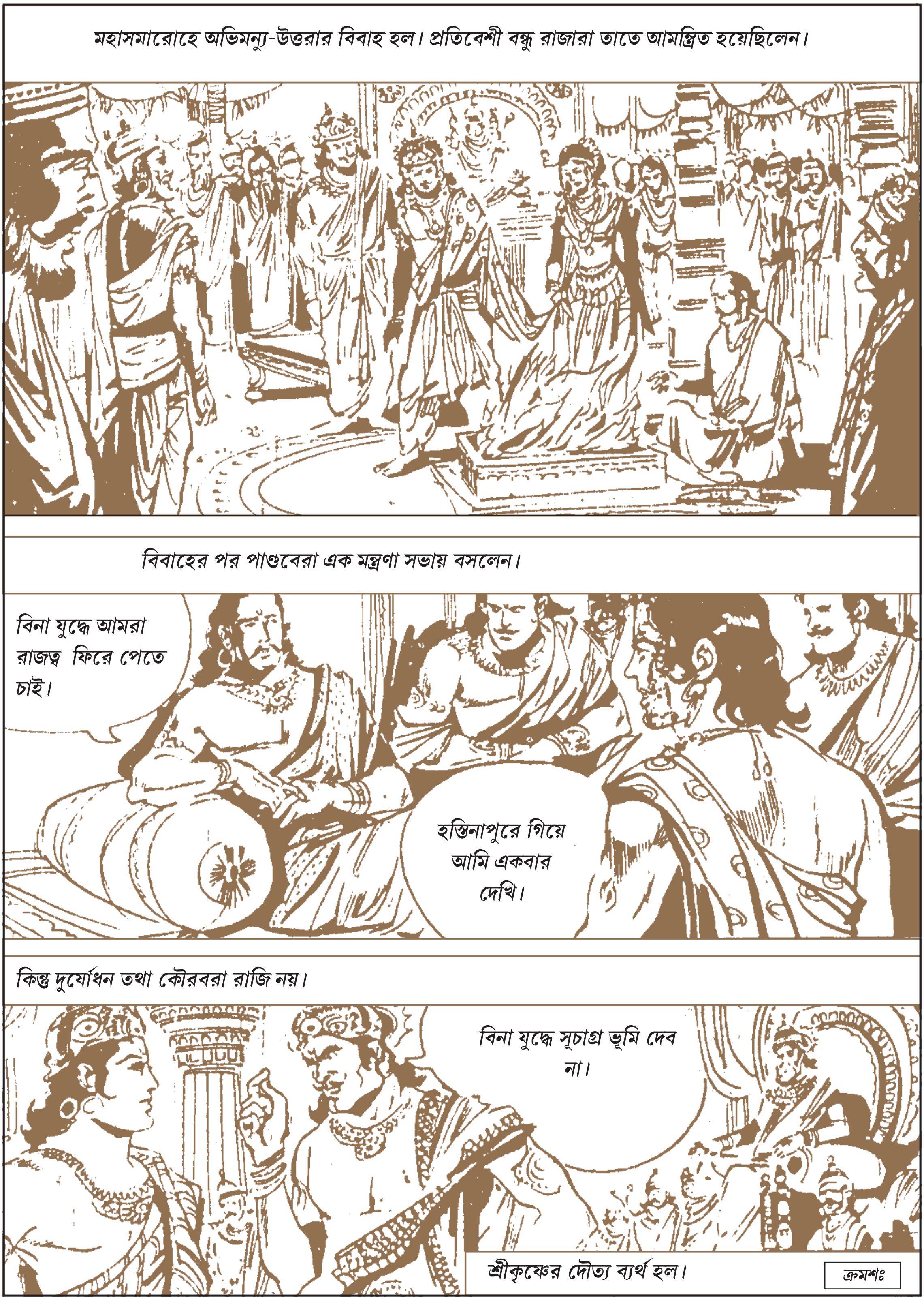

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18
15 January - 2018 - Rs. 10.00,

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. || দাম ১০্ টাকা ||